দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জন্ম—১২৬৫ বাং

৺কাশী প্রাপ্তি—১৩৫০ বাং

ভূমিকা

পুণ্যচরিত মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহত্ত্বের কিছু পরিচয় জীবনে পাইয়াছিলাম। তাঁহার মহনীয় চরিত্রের প্রতি তাই আমার গভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান। তাঁহার এই জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র তলাপাত্র। তিনিও আমার বন্ধুজনের মধ্যে। তাগিদ আসিল একটি ভূমিকা রচনা করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভূমিকা রচনার পদ্ধতি আমার জানা নাই। তাহা ছাড়া ভূমিকা সেখানেই প্রয়োজন যেখানে কঠিন বিষয়-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে ভূমিকার সহায়তা বিনা চলে না। সে হিসাবে সহজ সরল এই পুস্তকের ভূমিকার কোনও প্রয়োজন নাই। ভূমিকার নামে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

মহেশচন্দ্রের বাল্যজীবনের দুঃখ দ্বন্দ্ব, ব্যবসায়ে সাফল্য, ধন উপার্জ্জন ও সদ্ব্যয়ের কথা অনেকেই জানেন—হয়তো অনেকে আমার অপেক্ষা বেশীই জানেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও তাঁহার মহত্ত্ব কোথায় তাহা হয়তো সকলের চোখে পড়ে না।

ব্যবসায়ে তাঁহার সাধুতা সর্ব্বজন বিদিত। এই সাধুতার গুণেই তাঁহার সুলভ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বিচার করিবার কোনো মানদণ্ড নাই। যখন তিনি সেবাব্রত খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের সুলভ ঔষধের ব্যবস্থা দেখিলেন তখন তাহা গ্রহণ করিয়া বাংলা দেশে চালাইলেন। তাঁহার চরিত্রগুণেই বাংলাদেশে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুলভ

প্রচার সম্ভব হইল। এই ভাবে বহু দীন দুঃখী লোকের জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

সকলের উপরে তাঁহার দান। তাঁহার অজস্র দানের কথা বাহিরের অনেকেই জানেন না। আমি আজ তাঁহার দানের গোপনীয়তা বিষয়ে দুই-একটি কথা মাত্র বলিব।

ইংরেজী ১৯০০ সালের কথা। তখন আমরা ছেলে মানুষ। কিছু দিনের জন্য কুমিল্লাতে শিক্ষা দানের কাজে লাগিলাম। তখন কুমিল্লাতে মহেশবাবুর স্বপরিচালিত কোনো শিক্ষা-মন্দির ছিল না। শিক্ষার জন্য দরিদ্র ছাত্র ও গুরুদের উদ্দেশ্যে যে দান তাঁহার ছিল তাহার অনেকটা তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড্ মাষ্টারের হাতে নিঃশব্দে ব্যবস্থা করিতেন। এই কাজে বহু দিন স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন। তাঁহার পরে ছিলেন স্বর্গীয় পার্ব্বতী দত্ত মহাশয়। তাঁহার পরে কিছু দিন এই কাজ আমাকে করিতে হইল। আমি মহেশবাবুর এই গোপন দানের পরিমাণ ও প্রকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

তখনও আমি মহেশবাবুকে চক্ষে দেখি নাই। লেখালেখির দ্বারাই এই যোগ। কয়েক মাস পরেই আমি কুমিল্লা ছাড়িয়া আবার কাশীতে শাস্ত্রালোচনার্থ গেলাম। মহেশবাবুর সঙ্গে যোগ আর রহিল না। বোধ হয় ইংরেজী ১৯০৩ সালে আমাকে কলিকাতা আসিতে হইল। তখন স্বর্গীয় গোবিন্দ মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের দুই-এক জন আত্মীয়ের মারফতে মহেশবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিল। ব্রাহ্ম-সমাজের সেবাব্রত কর্ম্মীদের সঙ্গে মহেশবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ ঘটিল কেমন করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, "আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদেরই কেহ কেহ আমাকে প্রথমে ব্যবসায়ে

প্রবৃত্ত করেন এবং ব্যবসায়ের প্রথম সব অভাব তাঁহারাই পূরণ করিয়া দেন। তাঁহাদের মহত্ত্বের এই ঋণ শোধ করার উপায় আমার নাই।” তখন দেখিলাম মতামত বিষয়েও তিনি খুবই উদার।

কুমিল্লার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় সারদা সুন্দর পাল মহাশয় ছিলেন মহেশবাবুর বন্ধু এবং আমার শ্বশুর স্বর্গীয় মধুসূদন সেন মহাশয়েরও বন্ধু। ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র রায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও মহেশবাবুর বন্ধু ছিলেন। এই সূত্রে মহেশবাবুর সঙ্গে আমার আরও ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিল। মহেশবাবু পুনরায় আমার মারফতে কোনো কোনো দানের ব্যবস্থা করিলেন। এই দানের একটি প্রধান সর্ত্ত—“কাহাকেও তাহা জানান চলিবে না, সংবাদ পত্রে বা কিছুতেই নহে।” যেখানে যখন মানুষের কোনো দুঃখ দুর্গতির খবর তিনি পাইয়াছেন তখনই তিনি তাঁহার সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছেন।

একবার এইরূপ একটা কাজে সঞ্জীবনীর সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এক আবেদন বাহির করিলেন। মানব-দুঃখের এই সংবাদ পাইয়া তাহাতে হাজার কয়েক টাকার একটা মোটা রকমের দান মহেশবাবু আমার হাতে দিলেন। তাহাতেও সেই একই সর্ত্ত, “আমার নাম যেন ঘোষিত না হয়।”

এতগুলি টাকা এক সঙ্গে পাওয়ায় কৃষ্ণকুমারবাবুর খুবই সুবিধা হইল। ইচ্ছা করিয়া না হইলেও কৃষ্ণকুমারবাবু এক সভায় হঠাৎ মনের আবেগে ঐ টাকাটার দাতার নাম বলিয়া ফেলিলেন। পরদিনই কাগজে তাহা বাহির হইল। আমিও তাহা দেখিয়া বিপদ গণিলাম।

ঠিক তাহাই হইল। মহেশবাবু আমাকে ডাকাইলেন। স্নেহের সহিতই আমাকে বলিলেন, “ভাবিয়াছিলাম আপনাকে দিয়া আমার

অনেক কাজ করাইব। কিন্তু দেখিতেছি তাহা হইবার নহে। আপনাকে যতটা দৃঢ় ধাতুর লোক মনে করিয়াছিলাম ততটা নির্ভরযোগ্য আপনি নহেন। তাই আপনার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকিলেও এই দানের মধ্য দিয়া যে সম্বন্ধ তাহার অবসান আজই হইল।”

দান সম্বন্ধে তাঁহার এই গোপনীয়তার অর্থ তখন বুঝি নাই। ক্রমে বুঝিতেছি, সে কথা আজ আলোচনা করিব না।

মহনীয়দের জীবনচরিত-কথার আজই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। কারণ আজ আমরা নাকি “স্বাধীনতা” পাইয়াছি। কিন্তু দেশের এমন দুর্দ্দিন আর কখনো দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। শঠতা, প্রবঞ্চনা, অসাধুতাব দ্বারা কে কাহাকে মারিবে, কে কেমন করিয়া নিজের নির্দ্দয় নির্ম্মম সম্পদ স্ফীত করিবে, নিরন্তর এই চিন্তা। কোনো মতে কিছু ধন সম্পদ যে ব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সকলের মাথা তাহার কাছেই নত। অমানুষিক অসাধুতার আজ কোনো লজ্জা বা ভয় নাই। গো-মাংসের ব্যবসায়ে স্ফীত ব্যবসায়ীই আজ গো-মাতার রক্ষার জন্য বক্তৃতা দিতেছেন! এই সব দেখিয়া “ধর্ম্মের” উপর লোকের আরও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। চরিত্র যেন দেশ হইতে আজ বিদায় লইয়াছে।

আমাদের বুদ্ধির অভাব নাই, অভাব চরিত্রের। চরিত্রের অভাবেই আমরা দুইজনে একত্র হইয়া কোনো কাজ করিতে পারি না। একলাও দিনের পর দিন একভাবে কোনো কাজ চালাইয়া যাইতে পারিনা লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আজ আমরা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছি।

আমরা একে অন্যের নিন্দায় মুখর। পরের শ্রী আমাদের অসহ্য। বড় চরিত্রকেও আমরা ছোট করিয়া নিজের মত না করিয়া পারিনা, নহিলে আমাদের ক্ষুদ্রতার যে তৃপ্তি হয় না।

মহেশচন্দ্র চিরদিনই চরিত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা মহনীয় মনে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বাঙ্গালী যদি মরে তবে সে তার বুদ্ধির অভাবে মরিবে না, মরিবে চরিত্রের অভাবে। কোনো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা চাতুরী এই চরিত্রভ্রষ্টদের রক্ষা করিতে পারিবে না।"

ইতিহাসও দেখাইয়াছে গ্রীসবাসীরা অতুলনীয় বুদ্ধি সত্ত্বেও হইল রোমানদের পদানত। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর হইলেও রোমানেরা সত্যনিষ্ঠা ও একতার বলে গ্রীসবাসীদের পদানত করিতে পারিল।

তাই এই দুর্দ্দিনে চারিত্র্যবীরদের স্মরণ করা অপরিহার্য্য মনে করিতেছি। বড় দুঃসময়ের মধ্যে এই সব জীবনী আমাদিগকে কিছু নূতন আলোক হয়তো দেখাইতে পারে। এই কারণে আজ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুণ্যচরিত বিশেষভাবে স্মরণ করি।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

উৎসর্গপত্র

পরমস্নেহাস্পদ ঈশ্বর পাঠশালা, রামমালা ছাত্রাবাস ও নিবেদিতা ছাত্রী নিবাসের ভাই বোনদের হাতে আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা দিলাম। দেশ ও সমাজের অকৃত্রিম দরদী, চরিত্রবলে বলীয়ান, সদা সাধনশীল যে মহাপুরুষের চরিত কথা আজ তোমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছি, তিনি যে তোমাদিগকে কত ভালবাসিতেন, তোমাদের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা-ভাবনা এবং অর্থব্যয় অকাতরে করিতেন তাহার সামান্য পরিচয়ও যদি এই পুস্তক পাঠ করিয়া তোমরা পাও তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। দেশের ছেলেরা চরিত্রবান, সদাপরিশ্রমশীল, শরীর-মন-আত্মায় শুদ্ধ, সুস্থ এবং দৃঢ় হউক ইহাই ছিল তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। আমার মনে হইতেছে আজও তিনি প্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া স্বর্গ হইতে তোমাদের দিকে উৎসুক নয়নে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিদান কী হইতে পারে, তোমরা নিজেরাই ভাবিয়া দেখিও, তোমাদের প্রতি এই আমার স্নেহের দাবী।

কুমিল্লা
৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫২ বাং

আশীর্ব্বাদক
শ্রীশ্রীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা

"জগতের লোক যখন প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে তখন অতি ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পাইলে অতি আহাম্মক ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য্য সফল করিতে পারে, কিন্তু প্রতিবাসীদের স্তুতি বা প্রশংসা না চাহিয়া অথবা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বদা সৎকার্য্য করাই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

"যদি তুমি কাহারও চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিও না। অবস্থা বিশেষে নিতান্ত নির্ব্বোধও বীরতুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। লোককে তাহার অতি সামান্য কার্য্য করিবার সময় লক্ষ্য কর; উহাতে মহৎলোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনায় সামান্য লোককে পর্য্যন্ত মহৎ করিয়া তুলে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই যাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব লক্ষিত হয়, তিনিই প্রকৃত মহৎ লোক।"

বিবেকানন্দ

মহেশচন্দ্র চরিত কথা

মুখবন্ধ

বিষয় অতি বড, শক্তি ও সাহস নিতান্ত অল্প; তাই অতি ভীত মনে, জনকয়েক স্বজনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আমি পূজ্যপাদ স্বর্গত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা কিছু বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আমার বয়স এখন তেষট্টি। যখন আমার বয়স মাত্র আট দশ বৎসর তখন হইতেই এই মহাত্মার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল; তদবধিই তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত অত্যন্ত বন্ধুভাবে আজ পর্য্যন্ত যুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের বৈষয়িক এবং পারিবারিক অনেক কাজের অংশ আমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতেই ৺মহেশ বাবুর (এখন হইতে এই প্রবন্ধে আমি ৺মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে 'কর্ত্তা মহাশয়' বলিয়া উল্লেখ করিব। তিনি জীবিত থাকা সময়ে আমি তাঁহাকে কর্ত্তা মহাশয়ই বলিতাম) আত্মীয়েরা মনে করিয়া থাকেন আমি কর্ত্তা মহাশয়ের জীবন কথা অনেক জানি। তাঁহাদের এই ধারণা হইতেই আমার উপর এই গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর এই ভট্টাচার্য্য পরিবারের সঙ্গে থাকিয়া এই পরিবারের ছোট বড় সকল ঘটনা এবং ছোট বড় সকলের চরিত্র এমন সুপরিচিত ও সহজ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের চরিত্রের কোন

বিশেষত্ব আমার চক্ষে ধরা পড়ে না। সব কিছুই আমার গা-সহা এবং চোখ-সহা হইয়া গিয়াছে। নিত্যকার পরিচয়ে এই একটা অসুবিধা আছে। চন্দ্র-সূর্য্য, আলো-বাতাস-জল সবই বিরাট এবং বৃহৎ হইলেও অভ্যস্ত চক্ষে তাহাদের বিরাটত্ব আমরা বুঝিতে পারি না, এমনি আমাদের স্বভাব। কর্ত্তা মহাশয়ের চরিত কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে।

দীর্ঘকালের পরিচয়ে অসুবিধা

আর এক কথা, ঋষি 'মেটারলিঙ্ক' লিখিয়াছেন মহাপুরুষকে কখনও মাপিতে যাইও না। তুমি দুর্ব্বল হইলে তোমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া সব কিছু গড়াইয়া যাইবে। নুনের পুতুলের সমুদ্র-জল মাপিতে গিয়া জলে মিশিয়া যাওয়ার কথাও জানি। এমন সব কথা এখন আমার মনে উঠিয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে।

সাধারণ লোক দ্বারা মহাপুরুষ চরিত বিচার অসম্ভব

এখন দেখা যাউক যে দুরূহ কার্য্যে সাহসী হইয়াছি তাহাতে কতটা কৃতকার্য্য হইতে পারি। আমি যখন প্রথম কর্ত্তা মহাশয়কে কুমিল্লায় ৺গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় দেখি তখন উহা ইং ১৮৯৬ সন হইবে। গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে তিনি ডাকিতেন "মা"; তাঁহার বাসায় থাকিয়া খাইয়া কর্ত্তা মহাশয় কিছুকাল পড়াশুনা করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে আত্মীয়, অনাত্মীয়, ছাত্র, কর্ম্মপ্রার্থী, উমেদার প্রভৃতি অনেক রকমের লোকই গিরীশবাবুর বাসায় ছিল। তখন সকল বড়লোকের বাসায়ই এমন দুই চারজন থাকিত। এই বাসায় সকলেই গিরীশবাবুর স্ত্রীকে "মা" ডাকিত। কিন্তু কর্ত্তা মহাশয়ের

অপরাপর সকল কাজের ন্যায় এই "মা" সম্বোধনেও এমন একটা প্রবল শক্তিশালী ঐকান্তিকতা (Sincerity) অনুভব করিয়াছি, যাহাকে ঋষি 'কার্লাইল' (Carlyle) বীরের (Heroর) প্রধান লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমার ধারণা কার্লাইল (Carlyle) ঐকান্তিকতা (Sincerity) দ্বারা কায়মনোবাক্যের সমন্বয় (Unity of Thought, Speech and Action)কেই বুঝাইয়াছেন।

"মা"

এই "মা" সম্বোধন জনিত আত্মীয়তা তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা লিখিতে গেলে একটা বিরাট পুস্তক হইয়া পড়িবে। বিরাট কিছু করিবার শক্তি ও ধৈর্য্য আমার নাই, স্থানও ইহা নয়। কেবল দু-একটা মাত্র কথা এখানে উল্লেখ করিব।

কর্ত্তা মহাশয় পিতার নামে ঈশ্বর পাঠশালা, মায়ের নামে রামমালা ছাত্রাবাস, রামমালা রোড করিয়াছেন। কৃতীপুত্র পিতা-মাতার নামে কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। পিতামাতার নাম রক্ষা এবং নিজের যশ সবই রক্ষা পাইল। কিন্তু চাটগাঁর পাহাড়ে, সীতাকুণ্ড তীর্থে প্রায় ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া যে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার নাম হইল "গিরীশ-ধর্ম্মশালা"। এই গিরীশচন্দ্র কে? কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত কি সম্বন্ধ—গিরীশবাবু কি তাঁহার পিতা? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের ব্যাখ্যা যে আমায় কতবার কতজনকে করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

গিরীশ ধর্ম্মশালা ও কৃতজ্ঞতা

কর্ত্তা মহাশয় দিন কয়েক ৺গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্ন খাইয়াছিলেন। এমন আরও কত শত জন তাঁহার অন্ন খাইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রীকে "মা" ডাকিয়াছিল—তাহারই ফলস্বরূপ এই কৃতজ্ঞতার

নিদর্শন—"গিরীশ ধর্ম্মশালা"। কি আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা! অন্তর স্বতঃই নমিত হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িতেছে।

কর্ত্তা মহাশয়ের এই "মা"র আশ্রয়ে আমার বাবা এবং কাকা ছিলেন। অতএব তিনি ছিলেন আমার "ঠাকুরমা"। আমিও তাঁহারই স্নেহে বাল্যে এমন কি যৌবনেও প্রতিপালিত হইয়াছি। এই মার কথা বলিতে গেলে আমার আত্মকথা অনেক আসিয়া পড়িবে। এমন মহীয়সী উদার হৃদয়া মহিলা আমি জীবনে আর দেখি নাই। আমার মাতৃহারা দুঃখময় জীবনে এই মহিলার স্নেহের পরশ না পাইলে আমি আজ একটি street-boyএ (অসহায় পথচারীরূপে) পরিণত হইয়া কোথায় যে গিয়া পড়িতাম তাহা চিন্তা করিতেও পারি না। তাঁহার কথা লিখিতে গেলেও একটী পুস্তক হইয়া উঠিবে।

আমার "ঠাকুরমা"

কর্ত্তা মহাশয়ের জীবন-কথা ৺ঠাকুরমার নিকট অনেক শুনিয়াছি। কর্ত্তা মহাশয় তাঁহার দোকান, আশয়-বিষয়, ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কথা ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার আদেশ বা মত চাহিতেন। ঠাকুরমা অনেক সময় বলিতেন— "মহেশ, আমি তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য বা বড় বড় কথার কি জানি বা বুঝি, আমি কি করিয়া উত্তর দিব?" কর্ত্তা মহাশয় তদুত্তরে বলিতেন—"মা ঠাকৃরুণ, আপনি বুঝেন আর না বুঝেন, আপনি যাহা বলিবেন তাহাতেই আমার মঙ্গল হইবে।"

"মা ঠাকৃরুণে"র প্রতি ভক্তি

এখানে বলা আবশ্যক ঠাকুরমার নিকট লিখিত কর্ত্তা মহাশয়ের চিঠিপত্রের জবাব ঠাকুরমা অনেক সময় আমাদ্বারাই লিখাইতেন। ইহাতেও কর্ত্তা মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা আমার জানিবার সুবিধা হয়।

একত্র থাকিতে গেলেই সব সময় সব বিষয়ে যে একমত হওয়া যায় তাহা নহে। ৺গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছেলে ৺রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌত্র ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়, শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ চালচলন, রীতিনীতি, কথাবার্ত্তাদি সকল বিষয়েই কর্ত্তা মহাশয় হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিলেন; তৎসত্ত্বেও এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতি কর্ত্তা মহাশয়ের যে পরিমাণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ দেখিয়াছি তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হই। গিরীশবাবুর স্বগ্রাম রোজদি—ঢাকা জেলায়। তাঁহার বাড়ী রোজদি গাঙ্গুলী বাড়ী—গাঙ্গুলী বাড়ীতে অনেক হিস্যা, অনেক লোক, ইহাদের সকলকেই কর্ত্তা মহাশয় পরম আত্মীয় মনে করিতেন। সে আত্মীয়তা অদ্যাবধি তাঁহার পুত্র শ্রীমান হেরম্ব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুবাবুরা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ইহা বড়ই সুখের কথা।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা।

কর্ত্তা মহাশয়ের সকল কাজে দেখিয়াছি শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা। তিনি দান করিয়াছেন যথেষ্ট। (Minimum খরচে Maximum উপকার) কম খরচ করিয়া বেশী উপকার হয় কিসে, দান সুপরিচালিত হইতেছে কিনা, কিম্বা দান করিতে গিয়া অদান হইতেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা বিশেষ অনুধাবন করিতেন। গিরীশবাবুও ছিলেন দাতা, কিন্তু তাঁহার দান ছিল অন্য রকমের, দান করিয়াই তিনি কর্ত্তব্য শেষ করিতেন—প্রার্থী বিমুখ হওয়াই ছিল তাঁহার কাছে পাপ।

কর্ত্তা মহাশয়ের দানের পেছনে পরিশ্রম ও চিন্তা

কর্ত্তা মহাশয় সম্পর্কে আমার ভগিনীপতি। আমি বলিতাম কর্ত্তা মহাশয় কাঁথা গায়ে সাহেব। (তাঁহার গায়ে অনেক সময়েই

একটা তুলায় আস্তিন কাটা জামা থাকিত)। বাস্তবিকই কর্ত্তা মহাশয় চালচলনে, কথাবার্ত্তায়, পোষাকে ব্যবহারে ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দু, কিন্তু তাঁহার চিন্তাপ্রণালী, কাজের ধারা, আইন, শৃঙ্খলা ও সময়ের নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল নিতান্তই সাহেবী। বাঙ্গালী ঢিলা স্বভাবকে তিনি একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার সকল কাজেই প্রকাশ পাইত অসাধারণ শক্তি এবং দৃঢ়তা। বাঙ্গালী জাতির চরিত্রগত দোষগুলির কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার অন্তরে যে কি দাহ উপস্থিত হইত তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

কর্ত্তা মহাশয় পোষাকে হিন্দু কাজে খাটি সাহেব

যখন তাঁহার চক্ষের সাম্‌নে জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রকাশক এমন কোন ঘটনা পড়িত তখন তিনি এত বিচলিত হইতেন যে সময় সময় আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। দান বা সাহায্যপ্রার্থী যুবক নিকটে আসিয়া নিজের বক্তব্য সোজা এবং সহজভাবে প্রকাশ না করিয়া যখন কর্ত্তা মহাশয়ের পায়ে পড়িতে চেষ্টা করিত অথবা (sneakingly & beggarly—কাপুরুষের ন্যায় দীনহীন ভাবে) কাচুমাচু খাইত তখন তিনি তাহাদের অন্তরের দৈন্য দেখিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন। সময় সময় এত উত্তেজিত হইতেন যে, হাতের ছড়ি দিয়া তাহাকে মারিতেও উদ্যত হইতেন। আমরা যখন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক ছিলাম তখন কর্ত্তা মহাশয়ের এমন সব কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইতাম এবং ভাবিতাম—তিনি এমন সব করেন কেন? কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি, জাতীয় দুর্ব্বলতা, দৈন্য এবং কুশিক্ষা তাঁহাকে এত পীড়া দিত যে, তিনি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন।

জাতীয় দৈন্য ও দুর্ব্বলতায় মনোবেদনা

দেশাত্মবোধ ছিল তাঁহার প্রবল। কুশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্য-পীড়নে তাঁহার দেশ ও সমাজ একান্ত জর্জ্জরিত, পিষ্ট এবং অবসন্ন তাহা তিনি অত্যন্ত সত্যভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। উদ্যমহীন চিন্তা এবং কর্ম্মহীন কথাদ্বারা যে ইহার প্রতিকার হইবে না তাহাও তিনি সত্য করিয়াই জানিতেন। এক কণা কর্ম্ম যে শতকথার জালকে ছিন্ন করিয়া স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হয় তাহা তিনি বুঝিতেন বলিয়াই কথার দিকে একটুও না গিয়া কর্ম্মের দিকেই তিনি তাঁহার সকল শক্তি ও সকল বুদ্ধি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

দেশাত্মবোধ এবং কথা ও কাজ

তাঁহার দেশাত্মবোধে দেশটা যেমন ছিল অতি ছোট, কর্ম্মপ্রচেষ্টাতেও কর্ম্মটা আরম্ভ হইত অতি ছোট ভাবে। ছোট দেশ এবং ছোট কর্ম্ম নিয়াই প্রথম তিনি চলিতে আরম্ভ করিতেন। ছোটকে বড় করিয়া তোলা, এবং নিজেকে সম্প্রসারণ করিয়া গ্রাম, এবং গ্রাম হইতে সমাজ, সমাজ হইতে দেশে যাওয়াই ছিল তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি। তাঁহার কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত সাধারণ কাহারও কর্ম্মপদ্ধতির মিল হইতনা বলিয়াই তাঁহাকে সারাজীবন একাকীই চলিতে হইয়াছে। সভা, সমিতি, কমিটি, মিটিং, রিজলিউসন, ইত্যাদি বিরাট বিরাট ব্যাপার লইয়া যে সকল কর্ম্ম তাহাতে যোগদান করিয়া কাজ করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্টই হইত।

ছোট গণ্ডী লইয়া অন্য নিরপেক্ষ কাজ

ক্ষুদ্রে সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা, সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া কি প্রকারে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া তুলিতে হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঈশ্বর পাঠশালা, রামমালা ছাত্রাবাস, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং (কুমিল্লা)

লিমিটেড এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতাতে রহিয়াছে। এক রামেশ্বর নাথকে লইয়া কুমিল্লায় যে কাপড়ের দোকানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা এখন এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং (কুমিল্লা) লিমিটেড হইয়াছে। একখানা কেরোসিনের টীনের ঘরে কয়েক জন মাত্র ছাত্র লইয়া যে শিশু পাঠশালা কুমিল্লায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহাই কালে দেশ বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালা হইয়াছে। বন্‌ফিল্ডস্ লেইনে শরৎ বাবুর দালানের ছোট একটি অন্ধকার কোঠায গুটি চার আলমারী লইয়া যে 'ইকনমিক ফার্ম্মেসী' পত্তন হয়, তাহাই বর্ত্তমান ৮৪নং নেতাজী সুভাষ রোডের (প্রাক্তন ক্লাইভ ষ্ট্রীট) বিখ্যাত 'ইকনমিক ফার্ম্মেসী'। তিনি ক্ষুদ্র আরম্ভের উপদেশ সর্ব্বদা সকলকে দিতেন।

বৃহতের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র সূচনা

কর্ম্মে একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠতাই কর্ম্মসাফল্যের প্রধান উপায় ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কাজের কথা উঠিলে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"তাঁরে না ভজিলে তিলে তিলে, দণ্ডে দণ্ডে না ভাবিলে, শুধু মুখের কথায় গোরাচাঁদ কি মিলে?" সামান্য তালুক জমা জমির উপর নির্ভর করিয়া সংসার চলে না এমন যুবককে তিনি বলিতেন—"এই সামান্য জমি জমা তালুক বিক্রয় করিয়া যে কোন একটা ব্যবসায় লইয়া বস, বাঁচিয়া যাইবে।" তাঁহার এমন সব কথা শুনিয়া বাইবেলের "Sell all and follow me (সব কিছু বিনিময় করিয়া আমার শরণাগত হও)" কথাটি মনে হইত। সকল সাধনারই বুঝি একই মূলনীতি।

কার্য্যে একাগ্রতা

সাধনার মূলনীতি

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বা বক্তৃতামঞ্চে আমরা যে দেশাত্মবোধের নমুনা সর্ব্বদা দেখিতে পাই তাহা হইতে কর্ত্তা মহাশয়ের দেশাত্মবোধ

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর ছিল। আজকাল দেখিতে পাই দেশের লোকের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়াও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া বা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া অথবা কবিতা ইত্যাদি রচনা করিয়া এমন কি কিছুরই ধার না ধারিয়া, দু' চারটা Slogan (হুঙ্কার) মাত্র উচ্চারণ করিয়াই দেশপ্রীতি রক্ষা করা যায়। কর্ত্তামহাশয়ের দেশপ্রীতিতে দেশের ছোট বড় সকলের সহিত অন্তরের যোগস্থাপনই ছিল প্রধান কর্ত্তব্য। এখানে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিব। একবার কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত ঢাকা যাইয়া আমাকে দিন তিনেক থাকিতে হয়। খাওয়া দাওয়ার পরই পিরাণ গায় দিয়া, ছাতি হাতে লইয়া আমাকে ডাক দিয়া বলিলেন—"শ্রীশ, চল যাই, একটু বেড়াইয়া আসি।" দুপুরের গুরু ভোজনের পর বেড়াইতে যাওয়া আমার পক্ষে যে খুবই প্রীতিকর হইত তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু কর্ত্তা মহাশয়ের অনবসর চিত্তে আরাম উপভোগ বা বিশ্রামের কোন বালাই ছিল না। "চল বেড়াইয়া আসি" বলিয়াই আমাকে নিয়া বাহির হইতেন। রাস্তায় গিয়া গাড়ী করিয়া যত পুরাতন আত্মীয় স্বজন এবং ত্রিপুরা জেলার ছোট বড় ঢাকা সহরে কে কোথায় কি ভাবে আছে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতেন। উকীল, ডাক্তার, পেন্সনার, ব্যবসাদার, মুদীদোকানওয়ালা, নাপিতের দোকানের নাপিত, বিটঘর গ্রামের এক নাপিতের ভাগিনা এমন কি বিটঘর গ্রামের কুটুম্ব এক মুদি-দোকানদার তাহারও সহিত দেখা করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে কে কেমন আছে, কি ভাবে আছে,—নচেৎ চলিবে কেন? এমন সত্যকার দেশপ্রীতি একান্ত বিরল, ইহা খুবই জোর করিয়া বলিতে পারি।

সত্যকার দেশাত্মবোধ

শ্রীমান হেরম্বের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর কর্ত্তা মহাশয়ের অভিপ্রায়মত আমি চাটগাঁ, কক্সবাজার, আদিনাথ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাই। যাইবার সময় কর্ত্তা মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন—"তোমরা যেখানেই যাও, ত্রিপুরা জেলার লোক খোঁজ করিয়া শ্রীমান হেরম্বকে নিয়া তাঁহাদের সহিত দেখাশুনা করিয়া আসিবে।" কর্ত্তা মহাশয়ের উপদেশমত আমি শ্রীমানকে নিয়া ত্রিপুরা জেলার লোক খোঁজ করিয়া দেখা করিতে গিয়াছি। অনেক জায়গায় মনে হইয়াছে যে আমাদের এই দেখা সাক্ষাতের পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া তাঁহারা যেন অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন।

বিদেশস্থ দেশী লোকের সহিত যোগপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা

বিটঘর গ্রামের বহুলোক বাহিরে থাকে। কর্ত্তা মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল সকলেই যেন ৺পূজার সময় বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হয় এবং এইরূপে পরস্পরের সহিত গ্রাম-বিষয়ে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাহাকেও কাহাকেও চিঠি লিখিয়া আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং যাহাদের বাড়ীতে ঘর-দুয়ার সম্প্রতি নাই তাহাদিগকে স্কুলবাড়ীতে থাকিবার জায়গা এবং একখানা পাকের ঘর তুলিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন।

জেলার সকল শ্রেণীর লোকের সহিত পরস্পর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহার মনে "ত্রিপুরা ডাইরেক্টরী" সঙ্কলনের কথা উদয় হয়। ত্রিপুরা জেলার কে কোথায় কি অবস্থায় আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত জন্ম-কর্ম্ম-পরিচয় ইত্যাদি ঐ ডাইরেক্টরীতে থাকিবে ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। একটা জেলার লোক নানা দেশে নানা ব্যাপার নিয়া থাকে। সে সব বৃত্তান্ত দেশের নূতন শ্রেণীর যুবকরা জানিতে পারিলে পরস্পরের সাহায্যে নূতন নূতন

ত্রিপুরা ডাইরেক্টরী

দেশে নূতন নূতন কাজে যাইতে উৎসাহ পাইবে এই ভরসা লইয়াই তিনি "ত্রিপুরা ডাইরেক্টরী" করিয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারাই হইয়াছিল, বাহিরের সাহায্য খুব বেশী পান নাই। কাজেই তাঁহার ডাইরেক্টরী খানাও অনেকটা অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা করিতেন যে এই কার্য্যে কোন সঙ্ঘবিশেষ হাত দিয়া একটা পূর্ণাঙ্গ "ত্রিপুরা ডাইরেক্টরী" করুক। আমি শুনিয়াছি মহেশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগ আয়োজন কোথাও কোথাও হইতেছে। এই স্মৃতি রক্ষার উদ্যোক্তা মহোদয়গণ যদি একখানা পূর্ণাঙ্গ "ত্রিপুরা ডাইরেক্টরী" প্রকাশের আয়োজন করেন তবে কর্ত্তা মহাশয়ের স্বর্গত আত্মা পরলোক হইতেও আনন্দ লাভ করিবেন এবং দেশেরও যথেষ্ট উপকার হইবে।

১৩৪৩ বাং সনে কর্ত্তা মহাশয় যখন নিজগ্রামে যান তখন তিনি পরলোকগত মুন্সেফ রাজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দক্ষিণা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রামের অনেককে চিঠি লিখিয়া বাড়ী আনাইয়া তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন তাহা আমি জানি।

গ্রামে আসিলে গ্রামের বাবুদের অথবা প্রধান প্রধান ব্যক্তিদেরই যে কেবল তিনি খোঁজ খবর নিতেন তাহা নয়, গ্রামের অতি সাধারণ দরিদ্র, নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষদেরও খোঁজ খবর নিতেন। কে কেমন আছে, কি করিয়া দিন চলে, ঘরে চাল আছে কিনা, স্বামী বা পুত্র ভাত দেয় কিনা ইত্যাদি, ইত্যাদি কত শত মরণ বাঁচনের তত্ত্ব নিতেন।

গ্রামবাসী মাত্রেরই কুশলাকুশল জানার আগ্রহ

কর্ত্তা মহাশয় শেষ বয়সে ৺কাশীতে ছিলেন। ৺কাশীর বাড়ীতে যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেই ঘরের দেওয়ালে রামমালা ছাত্রাবাস এবং বিটঘরের বাড়ীর নক্সা ঝুলান থাকিত। ঐ সকল নক্সা দেখিয়া বিটঘর ও রামমালার কাজ সম্বন্ধে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি "আমি ৺কাশী থাকিয়াও ৺বিশ্বেশ্বরের পূজা করি না। আমি পূজা করি বিটঘর গ্রামের এবং রামমালা ছাত্রাবাসের।"

জন্মভূমি বিটঘর ও রামমালা ছাত্রাবাসের প্রতি ঐকান্তিক সশ্রদ্ধ মমতা

সে অনেক দিনের কথা। একবার কর্ত্তা মহাশয় কমলাসাগর ষ্টেশন হইতে হাতীতে চড়িয়া বিটঘর রওয়ানা হন। বিটঘর বাজারের মঠ দেখা যায় এমন জায়গায় পৌছিলে তিনি হাতজোড় করিয়া "জননী জন্মভূমি"কে প্রণাম করেন তৎকালে তাঁহার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁহার মুখে আমি ঘটনাটির কথা শুনিয়াছি।

কর্ত্তা মহাশয়ের দেশ দেখিতে হইলে তাহার জন্মভূমি বিটঘর গ্রাম দেখিতে হইবে। বিটঘরের পুরাতন, মধ্য এবং বর্ত্তমান ইতিহাস জানিতে হইবে। বিলের মধ্যস্থিত গ্রাম বিটঘর, জলকাদা বেতবন পরিপূর্ণ বিটঘর এবং বর্ত্তমান বিটঘরের তুলনা করিতে হইবে।

এখানে একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। বিটঘরের প্রাচীন ইতিহাস বড় গৌরবের ইতিহাস। বিটঘরের প্রাচীন জমিদার রায় চৌধুরীদের কীর্ত্তিতে বিটঘর গ্রাম পরিপূর্ণ। মোট কথা ছত্রিশ জাতি অধ্যুষিত এই বিটঘর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রায় চৌধুরীরা এবং তাঁহারাই এ গ্রামকে মঠ, মন্দির, দেউল, দীঘি ইত্যাদি দ্বারা সাজাইয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ বন্দর ভৈরব বাজার এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কমলপুর, জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি আজও এই রায় চৌধুরী বাবুদের পূর্ব্ব পুরুষ ভৈরব দেওয়ান, কমল দেওয়ান, জগন্নাথ দেওয়ান প্রভৃতি মহাশয়গণের নামের সহিত জড়িত। এমনি প্রভাব ছিল একদিন তাঁহাদের। কালক্রমে দেশের সব বনিয়াদী বংশের যে অবস্থা হইয়াছে ইঁহাদেরও সেই অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় সবই ক্ষয় পাইতে বসিয়াছিল। কর্ত্তা মহাশয় যাহা করিয়াছেন তাহা মরিয়া যাওয়া গ্রামে নবপ্রাণ সঞ্চার মাত্র। সত্যকার দেশাত্মবোধ বিশিষ্ট একজনের চেষ্টায় কেমন করিয়া একটা মরিয়া যাওয়া গ্রাম বাচিয়া উঠে তাহা দেখিতে হইলে বিটঘর গ্রামে বেড়াইয়া আসিতে হইবে।

বিটঘরের বাবুরা

এখানেও কর্ত্তা মহাশয়ের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। লোকে যখন বলিত বিটঘর গ্রামের উন্নতি করিয়াছেন মহেশ বাবু তখন তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "বিটঘর গ্রামের উন্নতি আমি কি করিয়াছি? বিটঘর গ্রামের সব কিছু করিয়াছেন বাবুরা। তাঁদের দীঘি, তাঁদের স্কুল, তাঁদের রাস্তা-ঘাট, গোবাট, তাঁদের বাজার আমি সংস্কার করিরাছি মাত্র।" বাস্তবিক পক্ষে আমরা সর্ব্বদাই দেখিয়াছি গ্রামের সকল কাজে সকল ব্যাপারে গ্রামের বাবুদের সম্মান তিনি সকলের আগে দিতেন। মানীর সম্মান রক্ষার জন্য এতটা নিরহঙ্কার ভাব আমি আর দেখি নাই।

একান্ত নিরহঙ্কার

এখানে বলা আবশ্যক দেশের প্রাচীন পড়ন্ত বনিয়াদী ঘরগুলির প্রতি তাঁহার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি সর্ব্বদাই দেখিয়াছি।

বিটঘর এবং কাইতলা বাড়ীর জন্য মমত্ববোধ থাকা কর্ত্তা মহাশয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কাইতলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশাতে তাঁহার অন্তরে যে দুঃখ ছিল তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তায় অনেক সময় প্রকাশ পাইত। আখাউড়া ৺শরৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী, এমত আরও কয়েকটা বাড়ীর ছেলেদের কথা তিনি অনেক সময় অনেকদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এইসব ঘরের দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত, শিক্ষা-দীক্ষা হীন ছেলেমেয়েদের সহিত আলাপ ব্যবহারে তাহাদের পারিবারিক মর্য্যাদা অনুযায়ী মর্য্যাদা দিতে দেখিয়াছি। মানীর সম্মান দেওয়া তিনি নিজেকে সম্মান দেওয়ার মত জ্ঞান করিতেন।

প্রাচীন পড়ন্ত ঘরগুলির জন্য বেদনাবোধ

ভূম্যধিকারী, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল মনে হয়। তিনি বলিতেন—যাঁহার জমিতে বাড়ী বা দোকান তাঁহাকে একটু বিশেষ সম্মান দেখান আবশ্যক। জমিদার বা বাড়ীওয়ালা খুসী না থাকিলে তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া সুখ হয় না, কাজ-কারবারেও উন্নতি হয় না। কুমিল্লার একজন মুসলমান তালুকদার কর্ত্তা মহাশয়ের কুমিল্লার বাড়ীর অংশ বিশেষের জন্য বার্ষিক ২।০ সোয়া দুই টাকা অথবা এমনই সামান্য একটা কিছু পরিমাণ খাজানা পাইয়া থাকেন। ঐ তালুকদারের উহাই শেষ তালুক। কুমিল্লা বাড়ীর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি আদেশ ছিল যেন ঐ তালুকদার খাজানার জন্য আসিলে তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দেখান হয়। তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া জলওয়ালা হুকায় তামাক এবং পান দিতে হইবে। আমার মনে হয় কর্ত্তা মহাশয় মনে করিতেন এইসব তালুকদার

ভূম্যাধিকারীদের প্রতি সম্মান

জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষরাই ব্রাহ্মণ-সাধু-পণ্ডিত-মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতিকে চিরকাল নিষ্কর, জায়গীর, ব্রহ্মোত্তর, ইত্যাদি দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন; অতএব সমাজের সম্মান তাঁহাদের প্রাপ্য। গ্রন্থকারের নিজের তালুক-নিষ্কর-ব্রহ্মোত্তর সবই সরাইল পরগণায় মুসলমান জমিদার দেওয়ান সাহেবগণ কর্ত্তৃক তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কাইতলা ও বিটঘর-দেওয়ান বাড়ীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-পণ্ডিত প্রতিপালনের কথা হয়ত কর্ত্তা মহাশয়ের মনে হইয়া থাকিবে। এই সকল ব্যাপারে কর্ত্তা মহাশয়ের কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম প্রতিপালনের নিদর্শনই দেখিতে পাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি একাকী চলিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ইহার কারণও আছে যথেষ্ট। কর্ত্তা মহাশয় নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সামাজিক কর্ত্তব্য (Social Duty) সম্বন্ধে এদেশের লোকের সামান্য মাত্র জ্ঞানও জন্মে নাই। সুবিধা-সুযোগ উপস্থিত হইলে, জনসাধারণের টাকা এবং সম্পত্তি (Public money and public property) নিজের হইতে বেশী সময় লাগে না। যেখানে ইচ্ছাকৃত অসততা নাই, সেখানেও স্বভাবজাত গাফিলতিতে সহজেই দশের জিনিষ একের হইয়া পড়ে। সহরের অতি সম্ভ্রান্ত বাড়ীতেও সীমানা-চিহ্ন সরাইয়া বাড়ীর আয়তন বৃদ্ধি করিবার অন্যায় প্রয়াস দেখিতে পাই। কর্ত্তামহাশয়কে কিন্তু মিউনিসিপ্যাল-ড্রেইন বাঁধাইয়া মাটি ফেলিয়া মিউনিসিপ্যাল-রাস্তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি করিতেই দেখিয়াছি।

সামাজিক কর্ত্তব্য (Social Duty)

কুমিল্লা সহরে গোমতী নদীর থানার ঘাটটী সদর-ঘাট বলিয়া পরিচিত। সরকারী নিয়ম অনুসারে ঐ ঘাটে কেহ ঘাট-মাশুল আদায়

করিতে পারিত না। কিন্তু ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী কোন বড় লোক মাঝিদের নিকট হইতে ঐ ঘাটে বহুকাল হইতেই ঘাট-মাশুল আদায় করিতেছিল।

কুমিল্লা থানার ঘাট

কর্ত্তামহাশয় নিজে প্রায় আড়াই শত টাকা খরচ করিয়া ঐ বড় লোকের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। তদবধি ঐ ঘাটে ঘাট-মাশুল আদায় রহিত হয়। নিজের পয়সা খরচ করিয়া জনসাধারণের স্বত্ব রক্ষার জন্য এমন ভাবে একাকী মোকদ্দমা করিতে আমি আর দেখি নাই।

রেল, জাহাজ ও ডাক সম্বন্ধীয় কোন অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, দেশের লেখাপড়া জানা লোকদের এ সব বিষয়ে সজাগ থাকিয়া সর্ব্বদা অভিযোগ করা উচিত। তাহারা প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে দেশের জনসাধারণের পক্ষে প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সমাজ যে তাহাদিগকে টাকা-পয়সা খরচ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে, তাহার ঋণ অন্ততঃ এই প্রকার দুই-চারি খানা চিঠি লিখিয়াও কিছু শোধ করা কর্ত্তব্য।

Public Fund—জনসাধারণের টাকা সম্বন্ধে তাঁহার সচেতন কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে প্রকার প্রখর দেখিয়াছি, তাহা অতুলনীয়। সমিতি চাঁদা আদায় করিতে যে চাঁদার খাতা দেয়, তাহাদ্বারা চাঁদা আদায় হইল কি না হইল; আদায় বা অনাদায় অন্তে চাঁদার রসিদ বহি বা চেকমুড়ি আফিসে ফেরৎ গেল কি না গেল, সে সম্বন্ধে, কি সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ কি চাঁদা আদায়কারী মহোদয়, কেহই কোন খোঁজ রাখা আবশ্যক মনে করেন না। চাঁদার খাতা আনিয়াই আমরা সমিতিকে কৃতার্থ করিয়াছি, এমনি ছিল আমাদের মনের ধারণা। কর্ত্তামহাশয়ই আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে,

চাঁদার রসিদ এক একখানা চেক্। ইহা ফেরৎ না দিলে অত্যন্ত অন্যায় হয়, এমন কি সময় সময় চেকের অপব্যবহার দ্বারা দশের টাকা চুরিও হয়।

Public Fund (গণ-তহবিল) সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। তিনি বলিতেন Public Fund কে কখনও বড হইতে দিও না। বড় হইলেই উহাতে গলদ বাধিবে। যখন যেমন Fund হইবে তখন তেমনই খরচ করিবে। ইহাতে Fundএর অতিরিক্ত কাজ হইবে না এবং অবস্থা অনুযায়ী আয় ও ব্যয় হইবে।

Public Fund
গণ-তহবিল

কর্ত্তামহাশয় কুমিল্লা-হরিসভার সহিত যুক্ত ছিলেন। সভার কর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাঁহার উপদেশ না মানিয়া কতগুলি টাকা সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিলেন। হরিসভা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ঐ টাকা এবং তাহার সুদ অদ্যাপি ব্যাঙ্কে জমা থাকিয়া সুদের হিসাব বড় হইতেছে সত্য, কিন্তু কোন কাজে লাগিতেছে না। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মত দুঃসময়েও কোন জনহিতকর কাজে না লাগিয়া তাহা ঐ ভাবেই রহিয়া গেল।

আজকাল Right, Right (ন্যায্য দাবী ও অধিকার) করিয়া একটা চিৎকার দেশে খুবই শুনিতে পাই। কিন্তু Rightএর সঙ্গে যে Responsibility (দায়িত্ব) আছে তাহা স্বীকার করিতে বড় কাহাকেও দেখি না। Civic Right (পৌর-অধিকার)এর সঙ্গে Civic Duty & Responsibility (পৌর-ধর্ম্ম ও দায়িত্ব) চলে তাহা কর্ত্তামহাশয় আমাদিগকে অনেক সময় অনেক কাজে

Civic Right & Civic Duty
পৌর-অধিকার ও পৌর-ধর্ম্ম

শিখাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে বলিতে পারি, তাঁহাকেই আমি প্রথমতঃ দেখি যাতায়াত কালে গাড়ীতে কিম্বা জাহাজে ফল-ফলারি, আখ, ইত্যাদি খাইয়া খোসা-ছিবড়াগুলি একত্র করিয়া গাড়ী বা জাহাজ হইতে বাহিরে ফেলিয়া দিতে, এবং জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মুছাইয়া রাখিতে। ট্রেণে চলিতে, সামনের বেঞ্চে অন্য লোক থাকা অবস্থায়, পা রাখিয়া বসা অন্যায় ইহা প্রথমে তাঁহার নিকটই শিখি। রাস্তাঘাট অপরিষ্কার করা অন্যায়, বরং যথাসম্ভব নিজহাতে পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা তাঁহার দৃষ্টান্তেই বুঝিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে চলিবার সময় দেখিয়াছি কলিকাতা ফুটপাথের কলা বা আকের খোসা নিজহাতে সরাইয়া ফেলিতেছেন। আমার মনে হয় বর্ত্তমান কালের যুবক এবং অল্প বয়স্কদের এসব সামান্য সামান্য ঘটনা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা করিবার আছে; সেজন্যই খুঁটিনাটি এত কথা লিখিলাম।

কাজটা সামান্য বলিয়া তাহাকে কোন কাজে বা কর্ত্তব্যে কিছু মাত্র অবহেলা করিতে দেখি নাই; বরং ক্ষুদ্র হইলেই যেন তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতেন বেশী। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দু-একটী ঘটনা উল্লেখ করিব। সুপরিচিত জায়গায় ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার সময় আমাদের অনেকেই ব্যবহার করা টীকেটখানা টিকেট কালেক্টার মহাশয় না চাহিলে নিজ হইতে যাচিয়া দিয়া আসি না। রাত্রি বারটার গাড়ীতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছি; অত্যন্ত পরিচিত টীকেট-বাবু আমার নিকট টীকেট চান নাই এবং আমিও মাল-কুলি-শিশু ইত্যাদি নিয়া ব্যস্ত থাকায় খেয়াল করিয়া টীকেট কয়খানা দিয়া আসি নাই; টীকেট কয়খানা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে। পরদিন প্রাতে হিসাব

সূক্ষ্ম কর্ত্তব্য বোধ

মিলাইবার সময় পকেটের সমস্ত কাগজ-পত্র-পয়সা ইত্যাদি পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছি, সঙ্গের টীকেট কয়খানাও টেবিলের উপর রহিয়াছে, এমন সময় কর্ত্তা মহাশয় আসিয়া আমার টেবিলের কাছে উপস্থিত। তিনি টিকেটগুলি দেখিয়াই,—"টিকেট দিয়া আস নাই কেন?" প্রশ্ন করিলেন, এবং তখনি লোক দিয়া টিকেটগুলি ষ্টেশন মাষ্টার বাবুর নিকট পাঠাইতে বলিলেন। আমিত ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তখন কর্ত্তামহাশয় বলিলেন, "এই টিকেট গেইটে দিয়া না আসিলে তিন রকম দোষ হয়। প্রথম, তুমি Public Duty (নাগরিক কর্ত্তব্য)তে সাহায্য করিলেনা। দ্বিতীয়, বেচারা টিকেট-কালেক্টার তোমার প্রতি ভদ্রতা করিতে গিয়া কৈফিয়তের দায়ে পড়িল। তৃতীয়, এই Long-Journey (দূর-ভ্রমণ)র টিকেট দিয়া অসৎ লোক রেল কোম্পানীকে ঠকাইতে পারে। Long-Journeyর টিকেটে Halting Concession (ভ্রমণ স্থগিতের সুযোগ) বেশী। যাহারা একটানা চলিয়া আসে তাহাদের টিকেট অসৎ লোকের হাতে পড়িলে, উহা পাঠাইয়া আবার লোক আনিতে পারে। তিনি ইহা ৺কাশী হইতে কলিকাতায় আসিবার একখানা টিকেট দিয়া হিসাব করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। আমিত ভাবিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এই সামান্য বিষয়ে কত চিন্তা কত ভাবনা আর কতইবা কর্ত্তব্য বোধ!

ট্রামে-বাসে এমন অনেক সময় হয়,—গাড়ীতে অত্যন্ত ভীড়, ভীড়ের জন্য টিকিট করিতে না করিতেই গাড়ী গন্তব্যস্থানে পৌছিল, পয়সা না দিয়াই নামিতে হইল। এমতস্থলে, কর্ত্তামহাশয় বলিতেন, আর একদিন দুইখানা টিকেট কিনিয়া একখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবে,

নচেৎ তুমি ট্রাম-কোম্পানীর কাছে ঋণী থাকিয়া যাইবে। এমন ক্ষুদ্র বিষয়ে এত সততার কথা অল্পই শুনিয়াছি বা দেখিয়াছি। আমাদের মত সাধারণ লোকের সঙ্গে এই সকল মহাপুরুষের কতইনা পার্থক্য!

কাহারও সহিত কাজকর্ম্মের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সহিত তিনি সহজে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতেন না; অবশ্য কোন গুরুতর ব্যাপার হইলে বা অসততা প্রকাশ পাইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। তাঁহার নিজের চাকর, ধোপা, নাপিত, বেয়ারা, কর্ম্মচারী, প্রভৃতি কমই বদলাইতে দেখিয়াছি। কৈলাস নাপিত, আইনদ্দি ওস্তাগার, রামেশ্বর নাথ, রামেশ্বর সূত্রধর, আবদুল, আহাম্মদ আলী, প্রভৃতি রাজ-যোগালী-সূতার-চাকরদের সারাজীবনই তাঁহার নিকট কাটাইতে দেখিয়াছি। রামেশ্বর নাথ, আইনদ্দি ওস্তাগার দীর্ঘকাল তাঁহার কাজ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা কর্ত্তামহাশয়ের নিকট হইতে মৃত্যু পযন্ত পেন্‌সন্‌ও পাইয়াছিল। জিনিষাদি ক্রয় সম্বন্ধেও তাঁহার এই ব্যবস্থা দেখিয়াছি।

আশ্রিত প্রতিপালন ও সম্বন্ধ রক্ষা

কোন প্রকার অসততা না দেখিলে, তিনি কখনও সহজে দোকান পাল্টাইতেন না। লণ্ঠন প্রভৃতি বিক্রেতা রাধাবাজারের সাতকড়ি দাস, কাঠের ব্যবসায়ী বৌবাজারের ডি, এন্, দাস, কিঙ্কর পাল, প্রভৃতি ব্যবসায়ী মহাশয়দের সঙ্গে কর্ত্তামহাশয় প্রথম জীবনে কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসাগত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছিলেন। জানি না তালেব হোসেন দপ্তরী এবং সাইন-বোর্ডওয়ালা কৃষ্ণদাস অধিকারীর এখন কে আছে—সারাজীবন ভরিয়া তালেব হোসেনই কর্ত্তামহাশয়ের খাতাপত্র বাঁধিয়া দিয়াছে এবং কৃষ্ণদাস অধিকারীই

কর্ত্তামহাশয়ের সাইন-বোর্ড আঁকিয়া দিয়াছে। কিন্তু যখনই যেখানে তিনি কোন অসততা বা মিথ্যাচার দেখিয়াছেন তখনই সেখানকার সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। মিথ্যাচারকে তিনি গলিত কুষ্ঠের ন্যায় ঘৃণা করিতেন। বস্তুতঃ, কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিয়াছি তাঁহার চক্ষে মিথ্যা অতি সহজেই ধরা পড়িত, একবার ধরা পড়িলে আর উপায় ছিল না। তাঁহার সঙ্গে গোজামিল দেওয়া চলিত না, একদিন না একদিন মিথ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িত। মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যাভাসকেই তিনি সত্য মনে করিয়া কাজ করিতেন; কিন্তু মিথ্যা প্রকাশ পাইলে তিনি হইতেন ever uncompromising (চির-আপোষহীন)। কিন্তু দোষ করিয়া অনুতপ্ত হইলে এবং সরলভাবে সত্য প্রকাশ করিলে, তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেন। "Hate sin but not the sinner" (পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে নহে), এই নীতিকথা তাঁহার চরিত্রে ও কাজে আমরা সর্ব্বদা পরিস্ফুট দেখিয়াছি।

মিথ্যাচারে ঘৃণা

আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি তাঁহার কিরূপ গাঢ় নিষ্ঠা ছিল তাহার অনেক দৃষ্টান্তই আমি জানি। নীচে একটি দিতেছি।

সেদিন গ্রীষ্মকাল, বেলা ২টা কি ২॥টা হইবে। কুমিল্লা বাড়ীর খোলা নাট-মন্দিরে কর্ত্তামহাশয় একটা টুলের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছেন দেখিয়া আমি বলিলাম—"ডাক্তারেরা ত বলেন গরমের দেশে মধ্যাহ্নে একটু নিদ্রা যাওয়া ভাল, বিশেষতঃ বয়স্কদের পক্ষে। আপনি ত দুপুরে একটু বিছানাতে যাইয়া বিশ্রাম নিলে পারেন।" তিনি উত্তর করিলেন—"Law-makers should not be law-breakers (আইন

প্রণয়নকারীর আইন-ভঙ্গকারী হওয়া সমীচীন নহে)। আমি নিয়ম করিয়াছি এই বাড়ীতে কেহ দিনে নিদ্রা যাইবে না।” নিজের বেলায় কোন ত্রুটী বা ব্যতিক্রম হইলে অজুহাতের অভাব হয় না, ইহাই ত চিরকাল শুনিতেছি এবং দেখিতেছি। কিন্তু কর্ত্তামহাশয় আইন করিয়া সর্ব্বপ্রথম নিজের উপর প্রয়োগ করিয়া অপরকে উহা অনুসরণ করিবার উপদেশ দিতেন। অন্যকে ক্ষমা করা চলে, কিন্তু নিজকে কখনও ক্ষমা করা চলে না, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা।

আইন ও শৃঙ্খলা

কুমিল্লা বাসায় আমাদের তত্ত্বাবধানে টিকেট করিয়া যাত্রাগান হইত। আমাদের প্রতি আদেশ ছিল কেহ যেন বিনা টিকেটে গানে না আসে। পাছে নিজের বাড়ীর লোকেরা বিনা পয়সায় গান শুনিবার সুযোগ নেয়, সেজন্য প্রথমেই তিনি বাড়ীর জন্য কতকগুলি টিকেট কিনিতেন, এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য টিকেটের টাকা পাঠাইয়া দিতেন। এমন কত কত কথা জানা আছে।

কাজ না হওয়া ভাল, কিন্তু হইতে হইলে, শৃঙ্খলার সহিত হওয়া দরকার, ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। পূর্ব্বে কুমিল্লা শহরে বড় লোকের বাড়ীতে খোলা জায়গায় বাহিরের উঠানে যাত্রাগান হইত। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলেই গান শুনিতে পারিত—কোন নিষেধ থাকিত না। ফলে, অনিমন্ত্রিত আগন্তুকের সংখ্যা এত বেশী হইত যে, ঠেলাঠেলি, ভীড়, গোলমাল, হৈচৈ, ইত্যাদির জন্য কাহারও গান শুনার সুবিধা হইত না। সময় সময় দুষ্ট লোকেরা তামাসা দেখিবার জন্য চাঁদোয়ার দড়ি কাটিয়া দিত, অথবা ঢিল ছুঁড়িয়া গোলমালের সৃষ্টি

চিন্তা ও সংস্কারের এক দিক

করিত। তিনিও নিজে একবার তাঁহার পুত্র মন্মথের উপনয়ন উপলক্ষ্যে গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় যাত্রাগানের আয়োজন করেন। সেখানেও অত্যন্ত গোলমাল এবং হৈচৈ হয়। গুণ্ডারা সামিয়ানার দড়ি কাটিয়া দেয়—ফলে, গানটা একরকম পণ্ডই হয়। এমন বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল সহ্য করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিলে যাত্রাগানের এই বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইতে পারে। আবদ্ধ জায়গায় টিকেট করিয়া গান হইলে গোলমাল হইবে না, এমন ধারণা লইয়াই তিনি কুমিল্লায় প্রথম ঐভাবে যাত্রাগান প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। নিজের কিছু পয়সা খরচ হইলে, ইচ্ছা করিয়া গোলমাল করিবেনা ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। বাস্তবিক পক্ষেও তাঁহার বাড়ীর সুব্যবস্থা এবং নিজের কর্ম্ম পরিচালনা-পদ্ধতি গুণে মহেশ-প্রাঙ্গণে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই যাত্রাগান শুনিবার বিশেষ সুবিধা হয়।

সংস্কার প্রয়াসী কর্ত্তামহাশয়ের সর্ব্ববিষয়েই দেখিতে পাই পুরাতনে নূতনরূপ দেওয়ার চেষ্টা। এই গানের লভ্যাংশ জনহিতকর কোন কার্য্যে নিয়োজিত করিবার নিয়ম করিয়া তিনি একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। পাছে লাভ পাইয়া লোভ বাড়ে এই ভয়ে তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন বৎসরে চার-পাঁচ দিনের বেশী এরূপ গান হইতে পারিবে না। তাঁহার দৃষ্টি যে কতদিকে ছিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হই!

যাত্রাগানের বেলায় তাঁহাকে কদাচিৎ নিজে বসিয়া গান শুনিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিয়াছি একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করিতেছেন এবং দেখিতেছেন কোথায় কি হইতেছে। কাজের শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়াই যেন তিনি

সঙ্গীতের আনন্দ লাভ করিতেন। যেমন কর্ম্মজীবনে তিনি ছিলেন একক নিঃসঙ্গ, পারিবারিক জীবনেও তাঁহাকে দেখিয়াছি তেমনি একক ও নিঃসঙ্গ। তাঁহার ভাবধারা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত সাধারণের মিল ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে পারিবারিক জীবনেও অনেক সময় একাকী চলিতে হইয়াছে। তিনি শেষ বয়সে পুত্র শ্রীমান হেরম্বকে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবুকে তাঁহার সঙ্গী এবং বন্ধু হিসাবে পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত সকল কাজে ও সকল বিষয়ে তাঁহারা তাঁহার প্রধান সহায় এবং অবলম্বন ছিলেন।

কাজের শৃঙ্খলাই তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গীত ও আনন্দ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ত্তামহাশয় ছিলেন দেশী পোষাকে বিলাতি সাহেব। সাহেবী Law of Primogeniture (জ্যেষ্ঠাধিকার)কে তিনি সবিশেষ অনুমোদন করিতেন বলিয়া মনে হয়। ৺রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি একজনের এক ছেলেই থাকা উচিত; কাহারও বেশী ছেলে থাকিলে সম্পত্তির অধিকারী বড়কেই করা উচিত। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার এই মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তীকালে একজনের একাধিক ছেলে হইলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

তিনি যখন যে কাজ করিতেন সমগ্র প্রাণ দিয়াই করিতেন। "ভাবের ঘরে চুরি" তাঁহার মধ্যে ছিল না। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে দেখিয়াছি তিনি কেবল টাকা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। কোন কোন

বিবাহে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিবাহ্ সম্পাদন করাইয়া দিতেন। এখানে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুর কর্ত্তব্যবোধ, কর্ম্মে একাগ্রতা, সময়-নিষ্ঠা, আলস্যহীনতা, প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়াই কর্ত্তামহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুকে তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন।

বিধবা-বিবাহ

এখানে একটা কথা স্বতঃই মনে আসে। পূতঃ চরিতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী রামমালা দেবীর পুত্রের পক্ষে বিধবা-বিবাহ সমর্থন আপাতদৃষ্টিতে একটা বিসদৃশ ঘটনা বলিয়া মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষেও কর্ত্তামহাশয় সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রেই যে বিধবা-বিবাহ সমর্থনযোগ্য মনে করিতেন, তা নয়। যেখানে বিধবাগণ আদর্শ হিন্দু বিধবার ন্যায় জীবন-যাপন করিতে সমর্থ, সেখানে তাহাদিগের পুনর্ব্বিবাহের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকাই সমর্থন করিতেন। "নিবেদিতা"র প্রথম উদ্দেশ্য ছিল একটা বাল-বিধবাশ্রম করা; এখনও সেখানে বাল-বিধবাদেরই প্রথম দাবী বিবেচিত হয়। আবার যেখানে শাস্ত্রানুমোদিত বৈধব্যাচরণ প্রতিপালিত হওয়া অসম্ভব মনে করিতেন সেখানেই বিধবা-বিবাহে উৎসাহ দিতেন। বর্ত্তমান অন্নসঙ্কটের দিনে বিধবা মেয়ে কিম্বা বিধবা ভগিনীকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সসম্মানে রাখা অনেক পরিবারেই অসম্ভব হয় দেখিয়া, তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকেরা বিধবা হওয়ার পরও মাছ-মাংস খায় পরন্তু বিধবার আচরণ কিছুই করে না, এমন কি অনেক

পুনর্বিবাহ প্রথা লোপ পাওয়ায় সামাজিক প্রতিক্রিয়া

ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণও হইয়া থাকে, এই সব দেখিয়াই তিনি নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অতি আবশ্যক মনে করিতেন। আমাদের দেশে নমঃশূদ্র, পাটনী, শিকারী, মালী, প্রভৃতি কতগুলি জাতির মধ্যে একবার টাকা সংগ্রহ করিয়া বিবাহ করাই কষ্টকর। তারপর এক স্ত্রী মারা গেলে আর একবার বিবাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদুপরি উচ্চ বর্ণের অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ প্রভৃতি যে সকল নিয়ম ছিল তাহা তাহারা তুলিয়া দিয়াছে। ফলে, ঐ সকল সমাজে একদিকে বিপত্নীক পুরুষ, আর একদিকে পতিহীনা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এমতাবস্থায় ব্যভিচার ও দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়া বহু পরিবার একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে শিকারী, পাটনী, ঝাল, মালী, প্রভৃতি কতকগুলি জাতি লোপ পাইতে বসিয়াছে। সমাজের এই ব্যভিচার এবং দুর্দ্দশা দেখিয়াই কর্ত্তামহাশয় বিধবা-বিবাহের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

বিধবা-বিবাহ আলোচনাকালে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"বিধবা সংরক্ষণ ব্যাপারে আমি মাসিক তিনশত টাকা খরচ করি, আর বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে আমি খরচ করি মাসে মাত্র ষাইট টাকা। ইহা হইতেই বুঝিতে পার বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতিগতি কোন্ দিকে। যেখানে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ অনুমোদিত বৈধব্যাচরণ প্রতিপালিত না হইয়া নানা প্রকার ব্যভিচার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সেখানেই আমি বিবাহ দিয়া বিধবাদের একটা পথ ধরাইয়া দিতে চাই। অসৎ লোকেরা বিধবা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া তাহাদের জীবনকে বিষাদময় করিয়া তোলে ; কাজেই বিবাহ দিয়া আইনের আমলে আনিয়া দিলে তাহার কিছুটা বাঁচিয়া যায়। মধ্যপথে আটকাইয়া রাখিয়া এদিক ওদিক

কোন দিক না করাকে একটা মস্ত সামাজিক কুব্যবস্থা বলিয়াই আমার মনে হয়”।

তিনি ছিলেন সকল কাজে মননশীল। গতানুগতিকভাবে কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পুরাতন বিষয়কে নূতন ভাব, নূতন শক্তি, এবং নূতন প্রেরণা দ্বারা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার কর্ম্ম-পদ্ধতি। ঈশ্বর পাঠশালা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে একদিন কর্ত্তামহাশয়ের সঙ্গে খাইতে বসিলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা শ্রীশ, বলত কিছু টাকা দান করিতে হইলে, কিভাবে দান করিলে ভাল হয়?" উহা ১৯০৭ কি ১৯০৮ ইং সনের কথা। তাহার অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই আমি কর্ত্তা-মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পূজ্যপাদ ৺আনন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবুর পিতা) মহাশয় ও তাহার ভগিনী মুক্তিদা দেবী ও আমার "ঠাকুরমা"কে (শ্রীশ বাবুর মা ও কর্ত্তামহাশয়ের "মা ঠাকুরুণ") লইয়া বৈদ্যনাথ, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, হৃষীকেশ লছমন্‌ঝোলা, প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। পশ্চিমে বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা তখন প্রায় কোথাও ছিল না। সত্য বলিতে গেলে, তখন বাঙ্গালী তীর্থ যাত্রীকে অনেক সময় অনেক জায়গায় বেশ একটু লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইত। আমরাও দু-চার জায়গায় লাঞ্ছনা না পাইয়াছি এমন নয়। সে জন্যই, আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "পশ্চিম ভারতে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদের বড়ই অসুবিধা, এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে পশ্চিমের তীর্থগুলিতে বাঙ্গালী-ধর্ম্মশালা করিলে ভাল হয়"। কর্ত্তামহাশয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সহিত সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "রক্ষা করা কঠিন" এবং এই বলিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট

ধর্ম্মশালা বনাম স্কুল

পর আবার বলিলেন, "আচ্ছা কুমিল্লাতে একটা স্কুল করিলে কেমন হয়"? বিশেষ ভাবনা চিন্তা করিয়া কিছু করা বা বলা আমার মজ্জাগত ধর্ম্মের বাহিরে। আমি ভাবনা চিন্তা না করিয়াই হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম—"কুমিল্লায় তিনটি বড় বড় স্কুল আছে, আর একটা স্কুল করিয়া টাকা নষ্ট করিয়া কি হইবে? বরং স্কুল করিতে হইলে, সহরে স্কুল না করিয়া পাঁচ গ্রামে পাঁচটা স্কুল করিলে শিক্ষার বিস্তার হইবে বেশী"। তারপর তিনি আবার চুপ করিয়া গেলেন।

কর্ত্তামহাশয় একবার গয়ায় শ্রাদ্ধ করিতে যান। তখন তিনি পাণ্ডার বাড়ীতে না থাকিয়া শ্রীযুক্ত নিশীথ দত্ত মহাশয়ের বাসায় থাকেন। বিদেশে তীর্থযাত্রীদের যে সব অসুবিধা হয় তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া কলিকাতা ফিরিয়া কালীঘাটে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র জ্যোতিষীর তত্ত্বাবধানে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া ধর্ম্মশালা করেন। তাহা বেশী দিন চলে নাই। ইহাই তাঁহার প্রথম ধর্ম্মশালা বলিয়া জানি।

কর্ত্তামহাশয় আমার আত্মীয়, পরন্তু তাঁহার সহিত একত্রে বসবাস করিতেছি অনেকদিন; কিন্তু তথাপি তাঁহার কর্ম্ম ও চিন্তাধারা বুঝিবার মত বুদ্ধি ও শক্তি আমার সে বয়সে ছিল না। কোন একটা কিছু করিতে হইলে যে, একটা আদর্শ লইয়া ভাল করিয়াই করিতে হয়, অধিকন্তু, গতানুগতিক ভাবে না চলিয়া পুরাতন কাজে নূতন প্রাণ নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থান ও কালের উপযোগী করিয়া লইতে হয় এবং ইহাই যে কর্ত্তামহাশয়ের উদ্দেশ্য তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। কোন কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা সোজা, কিন্তু তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে বাড়াইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। কর্ত্তামহাশয় যে তাহাই করিতে চান আমি তখন তাহা বুঝি নাই।

সুচিন্তিত কর্ম্ম পদ্ধতি

পুরাতন জীর্ণকে নূতনভাব ও নূতন শক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া তোলার শক্তি যে তাঁহার কি পরিমাণ ছিল, তাহার সাক্ষ্য আমারা "কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাঘওয়ালা দাওয়াইখানা," "শরৎবাবুর কলেজ ষ্ট্রীটের হোমিওপ্যাথিক দোকান," এবং "ইকনমিক ফার্ম্মেসীর" ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত "ঈশ্বর পাঠশালা", "রামমালা ছাত্রাবাস" ও "গ্রন্থাগারের" মত বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলিও পুরাতনে নূতন প্রাণ সঞ্চারের ইতিহাস। পিতাপিতামহের বিদ্যাদান, মাতা-পিতামহীর (টোলের পড়ুয়াকে) অন্নদান প্রভৃতি বংশানুক্রমিক অনুষ্ঠান হইতেই বিদ্যাদান এবং বিদ্যার্থীকে অন্নদানের চিন্তা তাঁহার মনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই গতানুগতিকভাবে অতি সহজে এবং স্বল্প পরিশ্রমে কয়েকটা স্কুল এবং টোল করিতে পারিতেন। কিন্তু পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ পুরাতনকে বজায় রাখিতে গিয়া শক্তি ও অর্থব্যয় করিলে, নূতন জগত ও নূতন সমাজের কোন উপকার হইবে না, বরং সময় সময় যথেষ্ট অপকার হইবে, ইহা তিনি তাঁহার মননশীল চিত্তে সম্যক উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্বপুরুষাচরিত বিদ্যাদান এবং অন্নদান কর্ম্মে নূতনরূপ ও নূতন প্রাণ সঞ্চারস্বরূপ 'ঈশ্বর পাঠশালা' ও 'রামমালা ছাত্রাবাস' প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন।

পুরুষানুক্রমিক বিদ্যা ও অন্নদানের নবরূপ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মূল্য কমাইয়া এবং দেশে ঔষধের ডাইলিউসন, হোমিও-টিংচার, গ্লোবিউল, প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়া হোমিও-ঔষধের বাজারে কর্ত্তামহাশয় যে এক নূতন প্রাণ নূতন রূপ দিয়াছেন তাহার ইতিহাস আমা হইতে অনেকে ভাল জানেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মূল্য কমাইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হোমিও-ঔষধ প্রসারের সাহায্য করাতে বাঙ্গলার তথা ভারতের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। এই পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল অনেক, কিন্তু জাতীয় কল্যাণে উদ্বুদ্ধ তাঁহার শক্তিশালী দৃঢ় মন এইসব বাধা-বিঘ্নে আদৌ দমিয়া যায় নাই।

ব্যবসায় ও লোকহিত

এখানে একটা সংক্ষিপ্ত ঘটনা বলিলে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতা জোড়াবাগান অঞ্চলে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের ডিস্পেন্সারীতে আমি প্রায়ই বিকালে গল্পগুজব করিতে বসিতাম। ডাক্তার মহাশয় অনেক সময় মহেশ ভট্টাচার্য্যের ঔষধের নিন্দা করিয়া বলিতেন,—"কম দামের ঔষধ ভাল হয় না, আমি ম্যাঙ্গালোর ইত্যাদি স্থান হইতে ঔষধ আনাই।" কিন্তু দৈবাৎ একদিন দেখি, এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পনীর লেবেলওয়ালা কয়েকটা শিশির গায় জল দিয়া টেবিলের উপর ডাক্তারবাবু রাখিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য, এই লেবেল তুলিয়া নিজের লেবেল বসাইবেন। ব্যাপারত সবই বুঝিলাম, এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানীর ৵১০ ছয় পয়সা দামের সস্তা ঔষধ ॥০ আটআনা-ড্রাম হইবার কলে পড়িয়াছে।

এই ঘটনাটি আমি কর্ত্তামহাশয়ের নিকট বলিলে, তিনি উত্তর করিলেন—"ইহাতে আমারই লাভ।" তখন আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারি নাই; এখন বুঝিতেছি ইহাতে কর্ত্তামহাশয়েরই জয়। সত্যের জয়ই যে সকলের বড় জয়, তাহা কর্ত্তামহাশয় ভাল করিয়াই জানিতেন।

ব্যবসায়ে সততা

এখানে কর্ত্তামহাশয়ের উপর বিদেশী ব্যবসায়ীদের কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল তাহার একটা প্রমাণ উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

রাজসাহীর জমিদার ও উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় শেষ বয়সে ওকালতী ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করিয়া বিনামূল্যে ও বিনা পারিশ্রমিকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা জনসেবা কার্য্যে ব্রতী হন। পূর্ণবাবু অতি সাধু, পণ্ডিত ও অবস্থাপন্ন হইলেও চালচলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় অনাড়ম্বর ও সরল ছিলেন। আমি একদিন তাঁহার নিকট কোন কাজে গেলে, তিনি আমেরিকার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা বোরিক এণ্ড ট্যাফেলের একখানা চিঠি দেখান। পূর্ণবাবু বোরিক এণ্ড ট্যাফেলের কাছে খাঁটি ঔষধ পাওয়া যাইবে ভাবিয়া কিছু ঔষধ পাঠাইবার কথা লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে বোরিক কোং পূর্ণবাবুকে যে চিঠিখানা লিখেন, ইহা সেই চিঠি। চিঠিখানার মর্ম্ম এই—"এত অল্প পরিমাণ ঔষধ আমাদের এখান হইতে নিয়া আপনার সুবিধা হইবে না। আপনি নিঃসঙ্কোচে কলিকাতাস্থিত এম্, ভট্টাচার্য্যের 'ইকনমিক ফার্ম্মেসী' হইতে আপনার ঔষধ আনাইতে পারেন, ঔষধে কোনও প্রকার কৃত্রিমতা অথবা দাম বেশী হইবে না, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।"

বড় দুঃখের কথা আজ পূর্ণবাবু জীবিত আছেন কিনা কিম্বা সেই চিঠিখানা উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না।

কর্ত্তামহাশয়ের ব্যবসায়ের মূলনীতি

"সমাজ-সেবা" এবং "নিজের অর্থ রোজগার" এই দুইএর সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবসায় করাই ছিল তাঁহার ব্যবসায়ের নীতি। এই নীতিকে সত্যভাবে দৃঢ়হস্তে ধরিয়া রাখাতেই তাঁহার ব্যবসায়ে উন্নতি হইয়াছে, ইহাই আমার ধারণা।

কুমিল্লা-বাজারের কাপড়ের ব্যবসায় কি ছিল এবং কোথায় আসিয়াছে তাহার ইতিহাস অনেকেই জানেন না। তখনকার কাপড়ের বাজারে "চোরা-আফিস", "পূরা-আফিস", "হুংরত্তি", "রংরত্তি", প্রভৃতি কতগুলি সাঙ্কেতিক কথাত ছিলই, তার উপর কাপড়ের নীচে দর, দালালি, ভালমানুষী, পানের বাটা, নলদার হুকা, ইত্যাদি কতকিছু ছিল তাহা মনে করিতেও হাসি পায়। সাধারণ গ্রাম্যলোক কাপড় কিনিতে গেলে সাতে আর ছয়ে পনর, পনর আর পাঁচে একুশ, ইত্যাদি রকমের হিসাবও ছিল। হিসাবের কাগজ গ্রামের অতি অল্প লোকেই পড়িতে পারিত। আর পড়িতে জানিলেই বা কি? কাগজখানা যত্ন করিয়া পকেটে রাখিতে রাখিতেই পথে হারাইয়া যাইত! আবার অনেক সময় সঙ্গের গ্রাম্যদালাল বা মুরুব্বির হাতে কাগজখানা পড়িলে ইচ্ছা করিয়াই তাহারা উহা হারাইয়া ফেলিত। কর্ত্তামহাশয় প্রথমে এহেন বাজারে প্রবেশ করিয়া "একদর", "ক্যাশ-মেমো", "কাপড়ের কোণে দর লিখিয়া রাখা", প্রভৃতি প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া কুমিল্লার কাপড়ের বাজারকে অসততার হাত হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার দোকানের উন্নতি দেখিয়াই অন্যান্য দোকানদারগণ ক্রমে অসৎ দরদস্তুর ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়াছে। কাপড়ের দোকান দিয়া লাভবান হওয়ায় কোনও বিশেষত্ব নাই। এই সকল ব্যবসায় আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তামহাশয়ের মননশীল চিত্ত যে কুমিল্লার এই ব্যবসায়ের জীর্ণ-পচা-গলা প্রাণে নূতন জীবন, নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। এখন কুমিল্লার বাজারে প্রায় সব দোকানেই "একদর" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন হয়ত অনেকেই জানে না যে, কুমিল্লায় এই "একদর"

কুমিল্লার কাপড়ের বাজার সংস্কার

প্রতিষ্ঠা এবং কাপড়ের বাজারের অন্যান্য সংস্কার কর্ত্তামহাশয়ের চেষ্টাতেই হইয়াছে।

দোকানদারী করিতে গিয়া অযথা বেশী দাম নেওয়াকে যেমন তিনি অন্যায় মনে করিতেন, আবার বাজার করিতে গিয়া অযথা বেশী দাম দিয়া জিনিষ ক্রয় করাকেও তিনি অন্যায় মনে করিতেন। ইহাকে তিনি বলিতেন 'বাজার নষ্ট করা'। ভদ্রলোক খরিদ্দারদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, মান বা চাল বাড়াইবার জন্য অথবা 'ভাল মানুষ' সাজিবার জন্য কোন জিনিষ কিনিতে বাজারে যাইয়া অন্য দোকান যাচাই না করিয়া, অথবা দরদস্তর না করিয়া দোকানদারকে বেশী পয়সা দিয়া আসে। ইহা অন্যায়, যেহেতু ইহাতে অসৎ দোকানদারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের প্রথম জীবনে আমরা দেখিয়াছি সাহেবী দোকানের জিনিষ ভাল এবং খাটি ইত্যাদি অজুহাতে অনেকে বিলাতী প্যাক-করা পেটেণ্ট ঔষধও বাঙ্গালীর দোকান হইতে সোয়া-দুই টাকায় না কিনিয়া সাহেব-বাড়ী হইতে সাড়ে-তিন টাকায় কিনিয়া আনিয়াছে। বড় বড় ডাক্তাররাও কমিশন পাইবার লোভে সাহেব-বাড়ীর নাম উল্লেখ করিয়া প্রেস্‌ক্রপসন করিয়াছেন। দেশী দোকান বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন এসকল দুর্নীতি কলিকাতার বাজার হইতে অনেক কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই জানি।

ক্রয়-বিক্রয় নীতি

কর্ত্তামহাশয় ছিলেন ব্যবসায়ী; তিনি ব্যবসায় করিয়া বড় হইয়াছেন। দরিদ্র দেশের দরিদ্র সমাজের শত-সহস্র যুবকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন আসিতে পারে যে, কর্ত্তামহাশয়ের এই আর্থিক উন্নতির মূলসূত্র কোথায়? কি কি গুণকে অবলম্বন করিলে ভাল ব্যবসায়ী হওয়া যায়, ইত্যাদি। বহুকাল ব্যবসায়

ব্যবসায়-নীতি

সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একত্র থাকিয়া আমি তাঁহার ব্যবসায়ী চরিত্রের যে সন্ধান পাইয়াছি তাহা একটু আলোচনা করিলে এই সকল যুবকদের কিছুটা কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে, অথচ প্রবন্ধের পক্ষেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পূর্ব্বে এক জায়গায় বলিয়াছি যে তিনি বিশেষ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন না, সাধারণ বুদ্ধিরই লোক ছিলেন। তবে তাঁহার চরিত্রবল, পরিশ্রমশীলতা, ধৈর্য্য, কর্ম্মে নিষ্ঠা, সততা, মিতব্যয়িতা, প্রভৃতি গুণ যথেষ্ট ছিল এবং এই সব গুণের সহায়তায়ই তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবসায়ের মূলসূত্র, সমাজ সেবা এবং নিজের লাভ—এই দুইএর সামঞ্জস্য নিয়া ছিল তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিতেন—"যে ব্যবসায়ে সমাজের অকল্যাণ সম্ভাবনা আছে সেই ব্যবসায় অতি নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়। ব্যবসায়ে উচ্চ, নীচ ও অধম হিসাবে তিনি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন। যে ব্যবসায়ে সমাজের উপকার হয়, নিজেরও কিছু লাভ হয় সেই ব্যবসায়ই প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়। ব্যবসায়ে সততা একান্ত দরকার, পরোপকারের ইচ্ছাও থাকা আবশ্যক। সাধারণ খরিদ্দাররা অনেক সময় বুঝিতে পারে না তাহাদের আয় ও দরকার অনুযায়ী কি জিনিষ দিয়া কি কাজ করিলে, কাজও তুলনায় ভাল হয় অথচ টাকাও বেশী লাগে না। দোকানদারের তাহা বুঝিবার সুযোগ আছে, তাই কর্ত্তামহাশয় আমাদিগকে বলিতেন—"খরিদ্দার দোকানে আসিলে, তাহার কি দরকার, কি রকমে তাহার সুবিধা হইতে পারে তাহা ভাল করিয়া নিজে বুঝিয়া তাহাকে বুঝাইয়া জিনিষ বেচিও। মিথ্যা নমস্কার ও আদর আপ্যায়নের দ্বারা খরিদ্দারের মনস্তুষ্টি করিতে প্রয়াস না করিয়া কাজের

দিক দিয়া তাহার সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। দোকানদারকে সকল রকমে obliging nature (বিনীত স্বভাব)এর হইতে হয়। বাজারে সকল জায়গাতেই তোমার খাতির পরিচয় আছে, দরকার হইলে এবং সময় করিতে পারিলে, বিবাহাদি কোন আকস্মিক কার্য্যকালে অন্য বাজার করিতেও তোমার বাঁধা খরিদ্দারকে সাহায্য করিবে। ইহাতে তোমার বাজারে সম্ভ্রম বাড়িবে, তোমার খরিদ্দারও তোমার আপন জন হইয়া যাইবে।" মোট কথা কর্ত্তামহাশয়ের কাজের মূলে ছিল Service বা সেবা।

দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। পাওনা আদায় করিতে তিনি যেমন কঠোর ছিলেন, দেনা দিতেও তাঁহাকে তেমনি অস্থির হইতে দেখিয়াছি। সাধারণ দোকানদাররা ভাল পার্টির সহিত দেনা-পাওনার হিসাব শেষ করিতে চায় না। কিছু পাওনা থাকিলেও তাহা তাগাদা করিয়া নেয় না, এমন অনেক সময় হয়। কাহারও নিকট দেনা থাকিলে এবং তাহা নিতে না আসিলে, কর্ত্তামহাশয় নিজের লোক পাঠাইয়া দেনা শোধ করিতে বলিতেন। আমরা কত বার বলিয়াছি, "অমুক টাকা নিতে আসে না, আমরা কি করিব?" তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন, "বাড়ীতে গিয়া দিয়া আইস"। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তাঁহার ছিল এই পদ্ধতি। ঋণ করাকে তিনি সাংসারিক লোকের পক্ষে মহাপাপ মনে করিতেন। ব্যবসায়ের অবস্থা বুঝিয়া সময় সময় কাজে খাটাইবার জন্য কিছু কিছু ধার করা আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ ধারও খুব সুচিন্তিত ভাবে সম্পত্তির

দেনা-পাওনা সম্পর্কীয় নীতি ও ঋণ করা

অনুপাতে যত করিলে চলে, তাহাই করা উচিত। নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য, অথবা বাড়ীতে ক্রিয়া-কাণ্ড-উৎসব হইলে, মান রক্ষার জন্য ধার করিরা খরচ করা অত্যন্ত অন্যায় মনে করিতেন। যাহারা আয়ের অনুপাতে বেশী খরচ করিয়া সম্ভ্রম বজায় রাখিতে ধার-কর্জ্জ করে, অতি আপন জন হইলেও কর্ত্তামহাশয় তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা এবং উহা হইতেই কিছু সঞ্চয় করা, আর কিছু দান করা আবশ্যক, ইহাই ছিল তাঁহার নীতি। গরীবের বাপ-মা মরিলে, এবং টাকা-পয়সা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার সঙ্গতি না থাকিলে অরণ্যে গিয়া রোদন করিলেও স্বর্গত পিতামাতারা তৃপ্ত হন, ইহা তিনি অনেক সময় বলিতেন। সাধারণতঃ বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, ইত্যাদিতে দান করা তাঁহার নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল।

ব্যবসায়গত সুনাম

তাঁহার দোকানে ধারে ক্রয়-বিক্রয় নাই বলিলেই হয়। ধারে খরিদ করেন না বলিয়া, দেশ-বিদেশের বাজারে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর সম্মান ছিল। বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাহাদের অবিক্রীত মাল (Undelivered goods) এম্‌, ভট্টাচার্য্য কোং কে গছাইতে পারিলে, বাঁচিয়া যাইত। ধারে বিক্রয় প্রথাকে তিনি অসততা বলিয়াই মনে করিতেন। কারণ তাহাতে দুর্ব্বল-চিত্ত খরিদ্দারকে অবস্থার অতিরিক্ত কাজ করিতে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিপদাপন্ন করে। তিনি বলিতেন—"আমি ব্রাহ্মণ মানুষ ব্যবসায় করিতে আসিয়াছি; দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট না জুটাইয়া যখন ইচ্ছা তখনই যেন ব্যবসায় গুটাইয়া ফেলিতে পারি তেমন ব্যবস্থায় আমার চলা উচিত।"

অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি বৈশ্য সাজিলেও অন্তরে যে তাঁহার ব্রাহ্মণ্য ভাবই কাজ করিতেছিল, তাহা এখানেও আমরা দেখিতে পাই। তিল তিল করিয়া লাভ ও তিল তিল করিয়া সঞ্চয়, এই প্রথাকেই তিনি ঠিক পন্থা বলিয়া মনে করিতেন। একবারে বেশী লাভ করিবার চেষ্টাকে তিনি অসততা মনে করিতেন। তিনি নিজের অনুষ্ঠিত ব্যবসায় ছাড়িয়া অতিরিক্ত লাভের আশায় অন্যব্যবসায়ে হাত দেওয়াকে সমর্থন করিতেন না। বরং নষ্ট হইবার ইহাই একটা প্রধান কারণ এরূপ মনে করিতেন। একবার আমরা কয়েকজন মিলিয়া তাঁহারই পোষকতায় তাঁহারই দেওয়া Economic Bank (ইকনমিক ব্যাঙ্ক) নামে একটা ব্যাঙ্ক করিতে উদ্যোগী হই। ব্যাঙ্কটীর প্রাথমিক গঠন শেষ করিয়া গভর্ণমেণ্ট-রেজেষ্টারীও হয়। কিন্তু কর্ত্তামহাশয় মনে করিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিলে, তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মনোযোগ পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত কাজ হইতে সরিয়া পড়িবে; তাহাতে কাজের ক্ষতি হইবে। তাই তিনি উহাতে আর অগ্রসর হইলেন না। সেই ব্যাঙ্কটী অন্যের হাতে এখনও আছে। বস্তুতঃ তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি ছিল,—যাহা কর ভাল করিয়া কর, যথাশক্তি কর, লোভের বসে লাফালাফি করিও না। দিবার হইলে বিধাতা যে কোন সূত্রেই দিতে পারেন; তবে, Do your best and with all thy might (তোমার ক্ষমতানুরূপ যথাসাধ্য চেষ্টা কর)। আমাদের গ্রাম্য ভাষায় আছে, "আল্লার ঘরে মালের কি কম্‌তি আছে?" শেষ বয়সে কেহ তাঁহার নিকট ব্যবসায়ের উপদেশ

যদিচ বৈশ্য-বৃত্তি কিন্তু অন্তরে ব্রাহ্মণ

অদৃষ্টবাদ ও ঐশ্বর্য্য ভোগার্থে দান

চাহিলে, প্রায়ই তাঁহাকে কপাল দেখাইয়া বলিতে শুনিয়াছি—"আমি কি কিছু জানি? সবই অদৃষ্ট। কি করিয়া কি হইল, তিনিই জানেন।" তবে ধন-ঐশ্বর্য্য সত্যকার ভোগ করিতে হইলে যে দানের মধ্য দিয়া ভোগ করিতে হয়, ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের কথা। সে জন্য সকলকেই তিনি বলিতেন, "হাতে টাকা হইলে কিছু কিছু দান করিও। আয়ের একটা অংশ 'জাকাত দেওয়া' (মুসলমান-আইন) খুবই ভাল।"

তিনি বলিতেন—"ব্যবসায়ে লাভ-অলাভ নিতান্ত অনিশ্চিত। সে জন্য ভবিষ্যতে দুর্দ্দিনের জন্য ব্যবসায়ীর কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি হঠাৎ চালবৃদ্ধি হইয়া যাহাতে খরচের অনুপাত বৃদ্ধি না পায় সে দিকেও অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক—এসকল কথা নূতন ব্যবসায়ীকে মনে রাখিতে হইবে। অতিরিক্ত লাভের লোভে অনেক সময় নূতন ব্যবসায়ীরা মূলধন এদিক ওদিক ছড়াইয়া বিপদাপন্ন হয়, ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়। টাকার কামড় অনেকেই সহিতে পারে না বলিয়া, অনেকের ব্যবসায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্মচারীরা অনেক সময় ব্যবসায়কে বড় করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে, তখন খোদ ব্যবসায়ীর খব শক্ত হইয়া রাশ টানিয়া রাখা দরকার। কর্ত্তামহাশয় বলিতেন, "প্রত্যেক জিনিষেরই আপনা আপনি বড হইবার একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আছে। আপনা আপনি স্বাভাবিকভাবে যতটুকু বড় হইবার বড় হইবে, টানিয়া বড করিবার চেষ্টা করিলে গাছশুদ্ধ উপড়াইয়া যাইবে। Natural growthএর (স্বাভাবিক বৃদ্ধির) সাহায্য করাই আমাদের কাজ।"

ব্যবসায়ে সংযম

দেশের সর্ব্বত্র যে হাই-স্কুল গজাইয়া উঠিতেছে তাহাদের অধিকাংশই মূলতঃ কোন উদ্দেশ্য বা Idea (আদর্শ) লইয়া গড়িয়া উঠে নাই। প্রায় সবই অনুরোধে পড়িয়া দেওয়া ব্যক্তি বিশেষের টাকা দ্বারা হইয়াছে। কোন কোনটা বা জনকয়েকের চেষ্টায় সাধারণের চাঁদা দ্বারা হইয়াছে। উদ্দেশ্য নিজের নাম বা পিতৃপুরুষের কাহারও নাম প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ছেলে গড়িবার আদর্শ ও সাধনা লইয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশে কয়টি স্কুল গঠিত হইয়াছে, তাহা জানি না। তবে এরূপ স্কুলের সংখ্যা যে খুবই কম, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি। প্রতিষ্ঠাতার সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য, পরিশ্রম, চিন্তাশক্তি ও অর্থব্যয়ে কুণ্ঠাহীনতা দ্বারা 'ঈশ্বর পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়াই যে ইহা বাঙ্গালা দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুলে পরিণত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বর পাঠশালার উন্নতির মূলসূত্র

অনিয়মিত ভাবে অথবা বিশৃঙ্খল ভাবে কোন কিছু করা কর্ত্তামহাশয়ের অভ্যাস ছিল না। নিয়ম ও শৃঙ্খলা তাঁহার আয়ে-ব্যয়ে ও দানে, সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি। কাঙ্গালী-বিদায়ের নামে ব্যবসাদার কাঙ্গালী জড় করিয়া, কতকগুলিকে কিছু দিয়া অন্যগুলিকে লাঠিপেটা করিয়া তাড়ানকে তিনি অত্যন্ত অন্যায় মনে করিতেন। সাধারণ কাঙ্গালী-বিদায় সচরাচর এইরূপই হইয়া থাকে, তাহা তিনি জানিতেন। তাই তিনি এরূপ উচ্ছৃঙ্খল কাজ না করিয়া বিলাতি Alms House (সাহায্য-প্রতিষ্ঠান)এর পক্ষপাতী ছিলেন। কুমিল্লা-বাড়ীর রেজেষ্টরীভুক্ত

সুশৃঙ্খল সাহায্য-প্রতিষ্ঠান বনাম কাঙ্গালী-বিদায়

নির্দ্দিষ্ট কাঙ্গালীর নিয়মিত বিদায় প্রথার ইহা হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

অবিরাম কর্ম্ম ও সময়ের মূল্য

কর্ম্মচিন্তা, কর্ম্মভাবনা ও কর্ম্মময় তাঁহার জীবন। কোন কারণে কর্ম্মহীন অবস্থা উপস্থিত হইলে, তাঁহার অসহ্যবোধ হইত। আমার দিদি (শ্রীমান্ হেরম্বের মা) ছিলেন রুগ্না, দার্জ্জিলিং গেলে তাঁহার শরীর ভাল থাকিত। কর্ত্তামহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাইতেন, কিন্তু তিনি দার্জ্জিলিং বেশীদিন থাকিতে চাহিতেন না, তাড়াহুড়া করিয়া চলিয়া আসিতেন। একবার আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"দার্জ্জিলিং ত খুবই সুন্দর জায়গা, তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন কেন?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"দার্জ্জিলিং বেশ সুন্দর জায়গা, দু-চার দিন লাগেও বেশ, কিন্তু সেখানে কাজ নাই বলিয়া বেশী দিন থাকিতে পারি না।" পরলোকগত পুত্র মন্মথের শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সমস্ত কাজ-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যখন বেলুড়-মঠের পাশে একটা বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কর্ম্মহীন অবস্থার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, তিনি মঠের সাধু-মহারাজদিগকে বলিতেন—"মহারাজ, আমার উপযুক্ত একটা কাজ আমাকে করিতে দিন, কাজ পাইলে আমি কতকটা শান্তি পাইব।" তখন মঠাধিপতি ছিলেন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ—তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তামহাশয়কে মঠের হিসাব পরীক্ষা করিতে দিলেন। কর্ত্তামহাশয় তাঁহার নিজ রুচি-সম্মত এই কাজ কিছুদিন স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য এবং বিচার-বুদ্ধি লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করিয়া, একদিন শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবুকে বলিলেন—"ইহাদের হিসাব পত্র খুব খুটি-নাটি করিয়া দেখিয়াও কোন ত্রুটি পাইলাম না। এখন হইতে মিশনকে কিছু কিছু

ঔষধ বা টাকা দিতে হইবে।” ইহার পর হইতে “রামকৃষ্ণ-মিশনে”র সহিত কর্ত্তামহাশয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। হিসাবপত্র পরিষ্কার না থাকা তাঁহার কাছে অসহ্য ছিল।

সকালে কাজ, দুপুরে কাজ, সন্ধ্যায় কাজ, দুপুর রাত্রেও কাজ! রাত্রিতে নীচের তলায় ঘুমাইয়া রহিয়াছি, মধ্যরাত্রে হঠাৎ জাগিয়া শুনি উপরতলায় মৃদু পদসঞ্চারণ শব্দ। কর্ত্তামহাশয় উপরের লম্বা বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন আর চিন্তা করিতেছেন কাজের কথা। তিনি ছিলেন নিজে কাজের মত্ততায় ভরপুর, অন্যকেও কাজে মত্ত থাকিতে দেখিলে হইতেন মহাখুসী। কোন কাজ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সময় অসময় বিচার ছিল না, তৎক্ষণাৎ কাজ সারিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। বাড়ী বা দোকানের কর্ম্মচারীদের নিকট আসিয়া কাহাকেও যদি কোন কাজের জন্য অযথা বসিয়া থাকিতে হইত, তবে তিনি ঐ কর্ম্মচারীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, সময় সময় ভর্ৎসনাও করিতেন। সময়ের মূল্য তাঁহার কাছে ছিল অনেক; তাই তিনি মনে করিতেন সকলেরই সময়ের মূল্য আছে। তিনি নিজে সময় নষ্ট করিতেন না, তাঁহার কর্ম্মচারীরাও যে অন্যের সময় নষ্ট করে, তাহাও তিনি দেখিতে পারিতেন না।

কুমিল্লা “রামমালা ছাত্রাবাসে”র কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তখনও এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠে নাই, কাজ চলিয়াছে চারিদিকে; কর্ত্তামহাশয় প্রতিদিন খাওয়ার পর তথায় যাইয়া কাঁঠাল গাছের নীচে একটা টুলের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন, আর সব খুটি-নাটি সংবাদ লইয়া যেখানে যাহা করিবার করাইতেন। সেই সময় তাঁহাকে আমি কতদিন যে তদবস্থায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।

সত্যই তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত যে, ধ্যানমগ্ন ঋষি ইষ্টসাধনায় স্বীয় আসনে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। আর মনে হইত ঋষি কার্লাইলের কথা—The works and all therein, were already a kind of new Bible to him, a book of books, which he must learn by heart.

নিজে খাটিয়া পরিশ্রমলব্ধ ফল মানুষ উপভোগ করিবে, ইহাই ছিল কর্ত্তামহাশয়ের চরিত্রগত ধারণা। বিনা পরিশ্রমে কোন কিছু পাওয়া আর সমাজ ও দেশের নিকট ঋণী হওয়া, তাঁহার নিকট একই কথা ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা দানমূলে কোন কিছু হাতে আসিলে তাহাতে পূর্ণ অধিকার জন্মে না। উহাতে খাটিয়া যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাই মাত্র তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে কতকটা ভোগ করিবার অধিকার আছে। বাকীটা সমাজ বা দেশের দান মনে করিয়া সমাজ এবং দেশ-সেবার কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি যথেষ্ট টাকাকড়ি থাকা সত্ত্বেও জমিদারী বা তালুকদারী ক্রয় করেন নাই। তাঁহার যখন বেশ আয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ, তাঁহাকে পুত্রের জন্য জমিদারী খরিদ করিতে বলিলে, উত্তরে বলিতে শুনিয়াছি—

প্রত্যেক মানুষেরই খাটিয়া খাওয়া উচিত

"জমিদারী কিনিয়া দিয়া ছেলেকে শ্রমবিমুখ বড়লোক এবং বিলাসী বানাইয়া দেওয়া আমি পাপ মনে করি। তাহার জন্য দোকান থাকিবে, পরিশ্রম করিলে এবং সৎভাবে থাকিলে খাইবার পরিবার অসুবিধা হইবার কোন কারণ নাই। দোকান চালাইতে হইলে, এখন হইতেই নিজের উপর নির্ভর করিতে এবং পরিশ্রম করিতে

শিখিতে হইবে।” নিজে পরিশ্রম না করিয়া পরের দেওয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলে মানুষের ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্য সবই নষ্ট হয় ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। অন্য হইতে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত ভোগ হয় উহার রক্ষণ, বৃদ্ধি এবং দানে; পরিশ্রমশীলতা ভিন্ন এবম্প্রকার ভোগ হইতে পারে না। পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ চাহিয়া তাহাদের জন্য যেমন তেমন করিয়া সম্পত্তি বা টাকাকড়ি রাখিয়া যাওয়া, তিনি সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করিতেন। বাস্তবিক পক্ষেও আমরা দেখিতে পাই, পিতৃসঞ্চিত বহু কষ্টের অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই পুত্রের ভোগ করা সম্ভব হয় না। পুত্রকে সম্পত্তি করিয়া দিয়া যাওয়ার চেয়ে, তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিশ্রমশীলতা, বুদ্ধি, ইত্যাদি গুণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। এই সব গুণের অধিকারী হইলে, পরবর্ত্তী জীবনে পুত্রগণ যে কোন ক্ষেত্রেই পড়ুক না কেন কোন রকমে সম্মানের সহিত চলিয়া যাইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার ধারা এই প্রকার ছিল বলিয়াই, তিনি তাঁহার আয় অনুযায়ী কোন সম্পত্তি অথবা নগদ টাকা জমাইয়া যান নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দান এবং ব্যয়ের চিন্তাই করিয়াছেন বেশী। Man must earn his bread by the sweat of his brow (মানুষকে তাহার শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা উচিত) ইহাই ছিল তাঁহার নীতি।

কর্ম্মে এবং চিন্তায় মৌলিকতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তবে কর্ম্মহীন চিন্তার বিলাস বা পরিকল্পনা-মাধুর্য্য তাঁহার নিকট ঠাঁই পাইত না। কেহ নূতন কিছু করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতেছে দেখিলে, তিনি এত উৎসাহ ও আনন্দ বোধ করিতেন যে, সেই কাজে নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইতস্ততঃ

করিতেন না। এই সূত্রেই তিনি কুমিল্লা "লেবার-হাউসে"র (Labour House) সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে লেবার-হাউসের কর্ম্মীদিগকে কেহ দুই টাকা দিয়াও তখন বিশ্বাস করে নাই, তাহাদিগকে তিনি বিনা রসিদে বহু সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। কর্ম্মীদের চিন্তার মৌলিকতা, পরিশ্রমশীলতা, কর্ম্মপরিচালন-বুদ্ধি এবং উদার পরিকল্পনা (কর্ম্মীগণ সকলেই সমান, প্রকারান্তরে সকলেই সমান মালিক, ইত্যাদি) দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একটা মৃত জাতির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি এই সম্বলহীন অসহায় যুবকদলকে এমন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। পরে লেবার-হাউসের কর্ম্মপরিচালকদের কাহারও কাহারও লক্ষ্য-ভ্রষ্টতা দেখিয়া এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া কাজটীকে বড় করিবার অতিরিক্ত চেষ্টা দেখিয়া, তিনি সরিয়া পড়েন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেবার-হাউসের প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ যথেষ্ট ছিল এবং পরিচালকবর্গের কাহারও কাহারও কর্ম্মশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কর্ম্মে ও চিন্তায় মৌলিকতা

কুমিল্লা "অভয়-আশ্রমে"র এবং প্রথম স্বদেশীযুগের জনকয়েক যুবকের মধ্যেও তিনি কর্ম্ম এবং চিন্তার মৌলিকতা ও জাতীয় জাগরণের স্বরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাকে এই সব ত্যাগী যুবকগণের গুণে মুগ্ধ দেখিতে পাই।

দেশের যুবকরা নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিয়া নূতন নূতন কাজে যাইতেছে দেখিতে পাইলে তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন এবং তাহাদিগকে

উৎসাহ দিবার জন্য নিজে গিয়া তাহাদের কাজ-কারবার দেখিতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। ১৯০২ ইং সনে নয়াদিলের শ্রীযুক্ত বিপিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে একটা Auction Mart (নিলাম-বাজার) খুলিয়াছিলেন। এমন নিলাম-বাজার দ্বারা দেশের পুরাতন অকেজো জিনিষ কাজে লাগিবার সম্ভাবনা হইয়া জাতীয় অপচয় কতক পরিমাণে নিবারণ হয়, অথচ ব্যবসায়টা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া আমাকে নিয়া ঐ দোকান দেখিতে যান এবং বিপিন বাবুকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করেন, ইহা আমার মনে আছে।

নূতন ব্যবসায় ও নূতন কাজে উৎসাহ বোধ

দেশে সম্প্রতি ভদ্রশ্রেণীর যুবকদের অনেক জুতার দোকান হইয়াছে ও হইতেছে। নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত নামক জনৈক শিক্ষিত যুবককে দিয়া তিনি কলিকাতায় ঠনঠনিয়ায় একটা জুতার দোকান করান, কিন্তু দোকানটা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

জ্যোতিষ ব্যবসায় একটু সম্ভ্রান্তধরণে পরিচালিত হইলে, তাহাদ্বারা অনেকের জীবিকার্জ্জনের সুবিধা হইতে পারে বুঝিয়া, তিনি নিজে বৃত্তি দিয়া কয়েকজন যুবককে জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়ান। আজ তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত নূতন পথে চলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বেশ সুখে-সম্মানে আছেন।

বিটঘর গ্রামের শ্রীযুক্ত দক্ষিণা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কর্ত্তামহাশয় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন দেখিয়াছি। এই স্নেহের মূল কোথায় এবং কি উপলক্ষ্যে কর্ত্তামহাশয়ের এই স্নেহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা আমার মনে আছে। তখন কয়লার খনির কাজে আমাদের এই অঞ্চলের অতি অল্প

যুবকই গিয়াছে। আমাদের জানা-শুনা লোকের মধ্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণা ভট্টাচার্য্যই প্রথম কয়লার খনির কাজে ঢুকিয়া পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়া খনির কাজে যান। এই নূতন লাইনে নূতন কাজে যাইবার ফলেই দক্ষিণাবাবু কর্ত্তামহাশয়ের এমন স্নেহভাজন হইতে পারিয়াছিলেন।

বিটঘরের ৺বিপিন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং কুটি-গুণসাগর গ্রামের শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবিরাজি ঔষধের কারখানা করিয়া চিন্তার মৌলিকতা এবং জীবিকার্জ্জনের নূতন পন্থা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তামহাশয়ের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। নিজে কবিরাজি না করিয়া ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে আমাদের এ অঞ্চলে তাঁহাদিগকেই প্রথম দেখি। কর্ত্তামহাশয়ের "বৈদিক ঔষধালয়ে"র পরিকল্পনা ইহাদের কবিরাজি কারখানারই পরিণতি বলা যাইতে পারে।

কলিকাতার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ষড়-দর্শনতীর্থ মহাশয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সবেমাত্র ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পুরাতন বাড়ীতে ডিস্‌পেনস্যারী খুলিয়া বসিয়াছেন। তদবস্থায় সর্ব্বদা কর্ত্তামহাশয়কে তাঁহার ঔষধালয়ে যাইয়া কেমন করিয়া আলমারী বসাইতে হয়, কেমন করিয়া দোকান সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে হয় তাহা অত্যন্ত স্নেহের সহিত দেখাইতে এবং বলিতে শুনিয়াছি। সচরাচর দেখা যায়, ব্যবসায়-কৌশল অভাবে অনেক বিদ্বান-পণ্ডিত ব্যক্তিও ব্যবসায়ে আশানুযায়ী উন্নতি করিতে পারেন না। কবিরাজ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠার সহায়তা কল্পে এবং দেশের যুবকগণকে কবিরাজী শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কর্ত্তামহাশয় কবিরাজ মহাশয়কে ছাত্র রাখার জন্য কিছুকাল বৃত্তিপ্রদানও করিয়াছিলেন।

"কুমিল্লা-ব্যাঙ্কিং-করপোরেশন" এখন একটি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত উকিল মহাশয় যখন তাঁহার কেরোসিন টীনে ছাওয়া বৈঠকখানা ঘরের ফরাসে তাহার একমাত্র মুহুরী বিপিন বাবুকে সহকারীরূপে লইয়া ব্যাঙ্কের আফিস খুলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন হইতেই এই নূতন কাজের প্রতি কর্ত্তামহাশয় আকৃষ্ট হন। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় দেশে নূতন, অথচ নিজেদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হইলে দেশে শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিবারও সাহায্য হয় না, ইহাদ্বারা কতগুলি নূতন লোকের জীবিকার্জ্জনের পন্থাও হইবে, ইত্যাদি তাঁহার

নূতন সৃষ্টির মোহ

মনে হইয়াছিল। এই ব্যাঙ্কের সহিত কর্ত্তামহাশয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তবুও দেশে একটা নূতন রকমের কাজ গড়িয়া উঠিতেছে ভাবিয়া তিনি শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়কে নানাভাবে সাহায্য এবং উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন। লোহার সিন্দুক কিনিবার মত যথেষ্ট টাকা ব্যাঙ্কের নাই, তাই তিনি ব্যাঙ্ককে ব্যবহারের জন্য লোহার সিন্দুক দিলেন। সিন্দুক রাখিবার মত উপযুক্ত নিরাপদ স্থান নাই, কর্ত্তামহাশয় বহু বৎসর নিজের দালানে ব্যাঙ্কের সিন্দুক রাখিতে দিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাঙ্ককে তিনি তাঁহার নিজের প্রভাব খাটাইয়া ডিপজিট হিসাবে অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সবচেয়ে বড়কথা সেই টীনের ঘরে উকিল বাবুর ফরাসে যখন ব্যাঙ্কের কাজ চলিতে আরম্ভ হয় এবং তাহারই পাশে একটা ছোট টেবিল এবং খান দুই চেয়ার দ্বারা গঠিত আফিসে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মহাশয় যখন আফিস করিতেন তখন কর্ত্তামহাশয়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে শ্রীযুক্ত দত্তমহাশয়ের সঙ্গে কাটাইতে দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। যাঁহাকে কখনও দু-চার মিনিট সময়ও

কোথাও গিয়া বিনা কাজে কাটাইতে দেখি নাই তিনি কি রস পাইয়া প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে থাকিতেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিয়াছি নূতন সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ হইয়াই তিনি দত্ত মহাশয়ের বৈঠকখানার প্রতি এত আকৃষ্ট হন। আগড়তলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী এবং একটু বাতিকগ্রস্ত (a man of ideas) বলিয়াই জানি। ত্রিপুরা ষ্টেটে ফলের বাগান করা এবং মৌমাছি প্রতিপালন করিয়া মধু সংগ্রহের ব্যবসা হইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে তাঁহার শক্তি অনুযায়ী অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা, মালদহ, সাহারানপুর, প্রভৃতি জায়গা হইতে নানাবিধ ফলের চারা ও কলম আনিয়া তিনি তাঁহার বাগানে রোপন করেন। চিনাবাদাম, নানা প্রকারের আনারস, ইত্যাদি চাষেরও চেষ্টা করেন। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে নিজে মাটি কোপান, জলসেচ করা, নানাভাবে তত্ত্বতদ্বির নিজেই করিতেন। মাষ্টার মানুষকে সর্ব্বদাই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। এতৎ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার স্বল্প আয়, স্বল্পবিত্ত সবই তাঁহার এই বাগান এবং মৌমাছির খেয়ালে খরচ করিয়া এক সময় অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কর্ত্তামহাশয় প্যারী বাবুর অধ্যবসায়, পরিশ্রমশীলতা, সততা এবং উচ্চ আদর্শের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার বাগানের উন্নতি কল্পে এই দুঃসময়ে কিছু টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্যারীবাবুর মুখে শুনিয়াছি। কর্ম্ম ও চিন্তার মৌলিকতার প্রতি কর্ত্তামহাশয়ের যে একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তাহা এখানেও দেখিতে পাই। দেশের যুবকরা সৎ, স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী হইয়া সৎভাবে নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ভাত-কাপড়ই প্রথম এবং প্রধান সমস্যা। কর্ত্তামহাশয় বলিতেন ব্যবসায় হিসাবেও ভাত-কাপড়ের ব্যবসায়ই বড়। সেজন্য তিনি কুমিল্লাতে কাপড়ের দোকান প্রতিষ্ঠার পর, একটা মুদী দোকান দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের পক্ষে মুদী দোকান দেওয়া অসম্ভব বলিয়া অনেককেই মুদী দোকান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ঈশ্বর পাঠশালার জনৈক শিক্ষককে আমার উপস্থিতিতেই বলেন—"আমি এক হাজার টাকা দিব আপনি একটা মুদী দোকান করুন। ভদ্রলোকের ছেলেরা পরিষ্কার পরিষ্কার ব্যবসায় করিতে চায়—তেল, গুড়, রাব, কেরোসিন, ডাইল-চাউলের ধূলা-বালি ধরিতে ছুঁইতে হইবে তাই কেহ মুদী দোকান করিতে চায় না। মুদী দোকান সকল ব্যবসায়ের গোড়া, কিন্তু কাজটা খুবই শক্ত। বড় ভেজাল আর রকমফের, সাধারণ দোকানদাররা ওজন ইত্যাদিতেও গোলমাল করিয়া থাকে। ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি সৎ থাকিয়া, ভাল জিনিষ খাঁটি ওজনে দিয়া কিছু দাম বেশী নিয়াও কাজ করে, তবে সমাজের উপকার হইবে, দোকানেরও উন্নতি হইবে। তবে প্রথম অবস্থায় সহ্য করিতে হইবে বেশী। পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন ৺কাশীতে ছিলেন তখন কুমিল্লার একটি বি, এ পাশ কৃতবিদ্য যুবক মুদী দোকান দিয়া অল্পকালের মধ্যেই বেশ উন্নতি করিয়াছে বলায় তিনি অত্যন্ত আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন—"এই ত কাজের মত কাজ।"

মুদী দোকান

আমাদের বাল্যকালে খবরের কাগজের মধ্যে সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীই ছিল প্রধান বাঙ্গালা খবরের কাগজ। বর্ত্তমান খবরের কাগজের তুলনায় ঐ সব কাগজে বাজে কথা থাকিত অনেক বেশী। দেশ-বিদেশের

আজগুবি, অকেজো খবর, উচ্চ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত কথা, ব্যক্তিবিশেষের বা কার্য্য বিশেষের সমালোচনা, অথবা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কথাই থাকিত বেশী। মফঃস্বলের কথা খুব কমই থাকিত, সাধারণ এবং দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর অভাব অভিযোগের কথা প্রায়ই থাকিত না। কর্ত্তামহাশয় খবরের কাগজের মিথ্যা কলেবর কমাইয়া, জনসাধারণ এবং নিম্নশ্রেণীর অভাব অভিযোগ ও মফঃস্বলের কথার উপর জোর দিয়া একখানা পত্রিকা প্রকাশ হউক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষ্যে তিনি শ্রদ্ধেয় ৺শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে তাঁহার মনোগতভাব প্রকাশ করিয়া মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় People and Pratibashi (পিপল্ এণ্ড প্রতিবাসী) নামে একখানা কাগজ প্রকাশ করেন। কাগজখানা কি জানি কেন বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

পিপল্ এণ্ড প্রতিবাসী পত্রিকা

কাজ ভাল ভাবে হইবে না ভাবিয়া তিনি ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেক সময় অনেক কাজ হইতে বিরত থাকিতেন। উপযুক্ত লোক না পাইলে কাজ আরম্ভ করা উচিত হইবে না, ইহাই ছিল তাঁহার চিন্তা-প্রণালী। তাঁহার বাড়ীর উৎসবাদিতে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও সর্ব্বদা তাঁহার ভয় ছিল ডাকিয়া আনিয়া যদি উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে না পারেন, তবে আহ্বান না করাই ভাল। বিশ্বাস করিতে পারেন, এমন কেহ ভার লইলে, তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং কাজ আরম্ভ হইলে একটুও ব্যয়কুণ্ঠ হইতেন না। মোটকথা খুবই নিয়মানুযায়ী এবং শৃঙ্খলার সহিত কাজ হওয়া চাই, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। আহ্বান করিয়া নিয়া অভ্যাগতগণকে যে কিরূপ আন্তরিক

আদর-যত্ন করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা বুঝিবার এবং জানিবার সুযোগ 'ঈশ্বর পাঠশালা'র শিক্ষকমহাশয়দের খুবই হইয়াছে। যখন তাঁহারা কর্ত্তামহাশয়ের আমন্ত্রণে ৺কাশী গিয়াছিলেন তখন তাঁহারা কর্ত্তামহাশয় হইতে যে শিষ্টাচার, আদর-আপ্যায়ন পাইয়াছিলেন শিক্ষকমহাশয়রা এখনও তাহা মাঝে মাঝে আনন্দের সহিত গল্প করিয়া থাকেন। বাড়ীতে উৎসবাদি ব্যাপার উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণাদি হইলে, দেখিয়াছি ব্যাপার মিটিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি উপবাসী থাকিতেন।

কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেই কর্ম্মী গঠন

কর্ত্তামহাশয় কোন কিছু গড়িয়া তোলার পূর্ব্বেই চিন্তা করিতেন, কাজটা রক্ষা হইবে কি প্রকারে? উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে কিনা যাহার হাতে কর্ম্মভার ন্যস্ত করিলে, কাজের ক্রমোন্নতি এবং রক্ষা সম্বন্ধে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাহাই ছিল তাঁহার প্রথম চিন্তার বিষয়। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই লোকসংগ্রহ করিয়া সেই লোককে নিজের কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার প্রথম কাজ। অন্যের গড়া লোক দিয়া নিজের অভীপ্সিত কাজ ভাল হয় না, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। বস্তুতঃ ৺কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য, ৺কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য, ৺শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফকিরদাস সরকার, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর দাস, শ্রীযুক্ত জানকী নাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মী তাঁহার বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধার ছিলেন ও আছেন তাঁহারা কর্ত্তামহাশয়ের নিজের হাতের গড়া লোক।

লোক গড়িতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। শিক্ষা-ব্যাপারে—"আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখানু সবারে" নীতির প্রতিই তাঁহার আস্থা ছিল বেশী। তিনি বক্তৃতা বা Sermon (নীতি-উপদেশ) দেওয়া ভাল বাসিতেন না; Example is better than precept (উপদেশ অপেক্ষা অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ) কথাটা বুঝিতেন ভাল। তাঁহার গড়া কর্ম্মচারীদিগকে আশে-পাশের ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই বেশী বেতন দিয়া নিতে দেখিয়াছি।

লোক নির্ব্বাচন করিয়া কাহাকেও কোন কাজের ভার দিলে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই ছিল কর্ত্তামহাশয়ের কাজের ধারা। সে নির্ভরশীলতার পরিমাণ কতছিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হই। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা, তাঁহার প্রতি কাজেই লক্ষ্য করিয়াছি। দুই-একটি উদাহরণ এখানে দিব।

নির্ব্বাচিত লোকের উপর নির্ভরশীলতা

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবুর উপর ছিল বিটঘর বাড়ীর উৎসবাদি ও খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যের ভার। বিজয়া দশমী দিন বিটঘরের অনেক লোক, স্ত্রী-পুরুষ, বাল-বৃদ্ধ নির্ব্বিচারে প্রতিমা-বিসর্জ্জনে খুব ঘটা করিয়া নদীতে যায়। সেবার কর্ত্তামহাশয়ও দশমী উপলক্ষ্যে নদীতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় উত্তর-পশ্চিম কোণে একখণ্ড বড় কাল মেঘ দেখিয়া তাড়াতাড়ি প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া যে যেমন পারে তাড়াহুড়া করিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবু একখানা ছোট কোষ-নৌকায় এদিক ওদিক ঘুরা ফিরা করিয়া দেখিতেছিলেন; কর্ত্তামহাশয় ছিলেন অপেক্ষাকৃত বড় একখানা নৌকায়। সকলে কর্ত্তামহাশয়ের নৌকা ছাড়িয়া দিবার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। এমন সঙ্কট সময়েও কর্ত্তামহাশয় শুধু বলিলেন "জগদ্বন্ধু কই"? অর্থাৎ

জগদ্বন্ধু বাবু না বলিলে তিনি নৌকা ছাড়িতে পারেন না, ইহাই তাঁহার মনের ভাব। পরে জগদ্বন্ধু বাবু আসিয়া "নৌকা ছাড়" বলিলে, নৌকা ছাড়া হয়। সেদিনকার তুফানে এ অঞ্চলে অনেক নৌকা ডুবি হয় এবং অনেক লোক মারা যায়।

আমার নিজের উপর একটা কাজের ভার পড়িয়াছে, নানাকারণে একটু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কর্ত্তামহাশয় অত্যন্ত অস্থির হইয়া আমার কাজের জায়গায় আসা-যাওয়া করিতেছেন। তৃতীয় বারের বেলায় আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলাম—"আমিই ত আছি"। তিনি শান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

শেষ কয়েকবৎসর কর্ত্তামহাশয়, ডাক্তারের নির্দ্দেশমত তাঁহার খাওয়া-দাওয়া ও ঔষধ-পথ্যাদি পরিচালনা যিনি করিতেন, তাহার প্রতি কতদূর নির্ভর করিতেন তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। কোন কিছু খাইতে ভাল লাগিতেছে, এমন সময় তদ্বিরকারক বলিল, "বেশী খাইলে সহ্য হইবে না"—অমনি কর্ত্তামহাশয় খাওয়া বন্ধ করিলেন। একদিকে যেমন আত্মসংযম আর একদিকে তেমনি একান্ত নির্ভরশীলতা।

অতি দুঃখের কথা এই একান্ত নির্ভরশীলতার অমর্য্যাদাজনিত তীব্র ব্যথাও তাঁহাকে অনেক সময় পাইতে হইয়াছে।

৺কাশীতে কর্ত্তামহাশয়ের একটা বিধবা-আশ্রম আছে। সেখানে বৃদ্ধা, কর্ম্মশক্তিহীনা জনকয়েক বিধবাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ইহারা প্রায় সকলেই দেশের দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবা। এই বিধবাশ্রমের বিধবাদিগকে কর্ত্তামহাশয় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। একবার এরূপ

খাওয়ার তিন-চারি দিন পূর্ব্বে তিনি বৌমাকে (পুত্রবধুকে) ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ মা, বিধবাশ্রমের বিধবাদের সহিত তোমার মিলামিশা এবং ভাব আছে, তাহাদের নিকট হইতে জানিয়া লইবে তাহারা কি খাইতে ভালবাসিবে। বিধবাদের রুচি ও ইচ্ছা বুঝিয়া তাহাদের ইচ্ছামত আগামী দিনের খাবার ব্যবস্থা করিও। তাহাদিগকে বলিও, তাহারা যেন লজ্জা না করে, মনের কথা যেন নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া বলে। প্রাণ খুলিয়া তাদের কথা বলিলে, আমি খুবই খুসী হইব।"

নিমন্ত্রিতের রুচি অনুযায়ী আয়োজন করিতে আগ্রহ

কোন বিপদ-আপদের সম্ভাবনা হইলে, অথবা রোগ-শোক, ইত্যাদি উপশমের জন্য আমরা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করিয়া থাকি। কর্ত্তামহাশয়ও এমত স্থলে শাস্ত্রানুমোদিত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি দৈবকার্য্যের ব্যবস্থা করিতেন; অধিকন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন স্বরূপে কাঙ্গালী বা বিধবা-ভোজন ব্যবস্থাও তিনি করাইতেন। এইসব কাজ-কর্ম্মের ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইত তিনি যেন কাঙ্গালী-ভোজন করানকেই প্রধান স্বস্ত্যয়ন মনে করিতেন। কুমিল্লা-বাড়ীর বেজেষ্টরীভুক্ত কাঙ্গালীদিগকে এইরূপ স্বস্ত্যয়ন হিসাবে বৎসরে তিন-চারিবার খাওয়াইতে দেখিয়াছি। এই বৃদ্ধ বয়সেও ৺কাশীতে প্রতিদিন কুষ্ঠী-ভোজনের সময় বারান্দায় টুলের উপর বসিয়া থাকিয়া কুষ্ঠী-ভোজন পরিদর্শন করিতে দেখিয়াছি। কুষ্ঠীদের খাওয়া হইলে তাহাদের জন্য রাঁধা দ্রব্য একটা থালায় করিয়া উপরে নেওয়াইয়া তিনি বলিতেন—"ইহা দরিদ্র-নারায়ণের প্রসাদ—তোমাদের যার যার ইচ্ছা এই প্রসাদ লইও, আর আমাকে

কাঙ্গালী-ভোজন শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন

একটু দিও।" পুত্র মন্মথের মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথে থাকাকালে নিয়মিতভাবে রোজ তিনি কাঙ্গালী-ভোজন করাইতেন। তখনও দেখিয়াছি তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঙ্গালী-ভোজন সমাপ্ত করিয়া তারপর নিজে খাইতে যাইতেন। কুমিল্লা-বাড়ীর কাঙ্গালী-ভোজনের দিনও তাঁহাকে দেখিয়াছি কাঙ্গালীদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি খাইতে যাইতেন না, এবং কাঙ্গালীদিগের খাওয়ার জন্য যে সব জিনিষ প্রস্তুত হইত তাহার অংশ অতি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেন। এই সব দেখিয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তিনি কাঙ্গালীদিগকে সত্য সত্যই নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথা এখানে মনে হইল—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

কর্ত্তামহাশয় তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন—তাহার অনেক উদাহরণ আমার জানা আছে। দোকানের বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অতি নিম্নতম কর্ম্মচারীদের প্রতি তাঁহার স্নেহ-মমতা যথেষ্ট ছিল। কাজের সময় তিনি ছিলেন বেশ একটু কড়া; কিন্তু অসুখ অস্বাস্থ্যের বেলায় অথবা সাংসারিক অশান্তির বেলায় খোঁজ-খবর লইয়া দরকার মত ঔষধ, পথ্য এবং অর্থ সাহায্য করিতে তাঁহাকে অনেক দেখিয়াছি। তাঁহার অতি সাধারণ কর্ম্মচারীদের কাহাকে কাহাকে বলিতেও শুনিয়াছি—"এখানে চাকুরী করিবার সময় হঠাৎ ব্যারাম-পীড়া হইলে, সেবা-শুশ্রূষা-ঔষধ-পথ্য চলিবে, এই ভরসা খুবই আছে।" এই বিদেশে কলিকাতার মত জায়গায় কথাটা খুব ছোট হইল না। বস্তুতঃ কর্ম্মচারীদিগকে

কর্ম্মচারীদের প্রতি ব্যবহার ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থা

এম্, ভট্টাচার্য্য কোং অসুখ-বিসুখে বিনামূল্যে ঔষধ এবং দরকার মত ডাক্তার সর্ব্বদাই দিয়া আসিতেছেন। বড় মিল বা ফ্যাক্টরী ইত্যাদি ভিন্ন সাধারণ দোকানে এমন ব্যবস্থা কোথাও আছে বলিয়া আমি জানি না। পুরাতন, চরিত্রবান, পরিশ্রমী কর্ম্মচারীদিগকে তিনি নিজের সহকর্ম্মী হিসাবে তাহাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাদের পরামর্শ এবং অভিমত না জানিয়া কোন কিছু করিতেন না। এখন যেমন "কর্ম্মচারী সমিতি" ইত্যাদি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনিব এবং কর্ম্মচারীর মধ্যে একটা সম্বন্ধ-নির্ণয়-দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে তেমন ছিল না—তখন মনিব-কর্ম্মচারী মধ্যে সাধারণ ব্যবহারে এবং কাজ-কর্ম্মে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধই ছিল। তখনকার দিনেও কর্ত্তামহাশয় দোকানের কর্ম্মচারীদিগকে লাভের কিছুটা অংশ বোনাস (Bonus) দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করেন। যখন বাজারে কোথাও "প্রভিডেণ্ট-ফণ্ড" প্রথার কথা কল্পনাও কেহ করে নাই, তখনও কর্ত্তামহাশয়ের দোকানে প্রভিডেণ্ট-ফণ্ড এর ব্যবস্থা হইয়াছিল; কাহাকেও কাহাকেও বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সন্ দিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন।

কর্ম্মচারীদের নৈতিক উন্নতি ও সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি

কলিকাতা সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কলিকাতার নৈতিক আবহাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। পথের ধারে, যেখানে সেখানে গণিকালয় এবং মদের দোকান এখন প্রায় নাই বলিলেই চলে। গ্রাম-দেশ হইতে অল্প শিক্ষা লইয়া আসিয়া এই আবহাওয়ায় পড়িয়া অনেকেই নষ্ট হইয়া যাইত। এই সর্ব্বনাশকর

আবহাওয়ার আওতায় যাহাতে না পড়ে, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি গুণ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, অধিকন্তু কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহাতে একটা সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা হয়, পীড়ায় সকলেই সকলের সাহায্য করে, এবং তাহারা স্বাস্থ্য, খাওয়া-থাকা, নৈতিক চরিত্র, ইত্যাদি সকল প্রকারে যাহাতে সুস্থ থাকিতে পারে তাহার জন্য তিনি খুবই চিন্তা-ভাবনা করিতেন। অবসরকালে তাহারা যেন সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারে, সে জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীদের মেছে একটা লাইব্রেরী করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মচারীরা অসুস্থ হইলে, তিনি যে কিরূপ আকুলি-ব্যাকুলি করিতেন, তাহা আমি সবিশেষ দেখিয়াছি। সে অনেক দিনের কথা—৺অতুল দত্ত নামে একটি কর্ম্মচারী তাঁহার দোকানে কাজ করিত। ছেলেটীর প্লেগ হয়, সে ১৯০২ কি ১৯০৩ ইং সন হইবে। তখন ৺কুমুদ বাবু ছিলেন ম্যানেজার। প্লেগের নাম শুনিলেই তখন মানুষ আতঙ্কে অস্থির হইত; প্লেগ-হাসপাতালের কথা মানুষ চিন্তা করিতেও ভয় পাইত। মিউনিসিপালিটির লোকেরা প্লেগ হইয়াছে জানিতে পারিলে, রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিত। প্লেগের হাসপাতাল হইতে কেহই ফিরিয়া আসে না, এমনি ছিল সকলের মনের ধারণা। অতুলকে হাসপাতালে দেওয়ার কথা হইয়াছিল, কিন্তু ৺কুমুদ বাবু তাহাতে সম্মত না হইয়া নিজেই সেবা-শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কর্ত্তামহাশয়ও ঘণ্টা দুই-ঘণ্টা পর পর রোগীর কাছে যাইয়া সমস্ত খোঁজ খবর নিতেন এবং কি করিতে হইবে না হইবে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

মেছ

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে কর্ত্তামহাশয় একেবারে স্থবির ও চলৎশক্তিহীন অবস্থায় ৺কাশীতে ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আবার আসিবেন, এমন আশা আমরা একটুও করি নাই। এমন সময় হঠাৎ

কলিকাতায় জাপানী বোমার বর্ষণ হইল—তাহার ফলে কলিকাতাবাসীদের মনে ভীষণ এক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। বিষয়-আশয়, কাজ-কর্ম্ম সব ছাড়িয়া মাথায় পুটুলি এবং পেছনে ছেলেমেয়ে নিয়া গাড়ীতে, জাহাজে, নৌকায়, পায় হাঁটিয়া, যে যেভাবে পারিল ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। এমন সময় কর্ত্তামহাশয় বলিলেন—"আমি কলিকাতা যাইব, আমাকে কলিকাতা নিবার বন্দোবস্ত কর, আমার কর্ম্মচারীরা বিপদ মাথায় করিয়া কলিকাতা থাকিবে, আর আমি এখানে আরামে শান্তিতে দিন কাটাইব, তাহা হইতে পারে না।" এই ঘোর বিপদের সময় যখন কলিকাতা প্রায় জনহীন হইয়া গিয়াছে, তখন কর্ত্তামহাশয় অচল শরীর লইয়া কলিকাতা আসিলেন। কর্ত্তামহাশয়ের তখনকার শারীরিক অবস্থা যাহারা অবগত ছিল, তাহাদের কাছে বিষয়টা স্বপ্নের মতই মনে হইয়াছে। প্রবল কর্ত্তব্য বোধ, কর্ম্মচারীদের প্রতি মমতা ও চিত্তের দৃঢ়তা যে তাঁহার কত শক্তিশালী ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারি। এখানে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। একবার কলিকাতা দোকানের দুইজন সাধারণ কর্ম্মচারী ৺কাশীতে যায়। তাহাদের জন্য বাসায় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এমন সময় কর্ত্তামহাশয় বৌমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"মা, কলিকাতা হইতে দোকানের দুইজন বাবু আসিয়াছে, তাহাদিগকে বেশ তৃপ্তিমত আয়োজন করিয়া খাওয়াইও। মা, ইহারাইত আমার পরম আত্মীয় ইহাদিগকে খুব আদর যত্ন করিও।"

গড়িয়া তুলিবার এবং রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন নূতন কাজে হাত দিতেন না। পশ্চিম ভারতে বাঙ্গালী তীর্থ-যাত্রীদের জন্য যাত্রী-নিবাস ইত্যাদি করিবার প্রস্তাব করিয়া আমি যে উত্তর পাইয়াছিলাম—"রক্ষা করা কঠিন"—তাহা পূর্ব্বে

বলিয়াছি। পরবর্ত্তীকালে যখন তিনি তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ৺কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্যকে ধর্ম্মশালা করিবার জন্য পাইলেন তখন তাঁহার চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তি এই নূতন পথে চালিত হইয়া ৺কাশীর হরসুন্দরী ধর্ম্মশালার পত্তন হইল। এই ধর্ম্মশালাকে কেন্দ্র করিয়া গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি পশ্চিম ভারতের তীর্থগুলিতে বাঙ্গালী হিন্দু তীর্থ-যাত্রীর যে সুবিধা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর্ত্তামহাশয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন।

হরসুন্দরী ধর্ম্মশালা ও ৺কুমুদ বাবু

৺কুমুদবাবু ছিলেন রক্তে মাংসে কর্ত্তামহাশয়ের আপন জন। তদুপরি অতি বাল্যকাল হইতেই কর্ত্তামহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তিনি তাঁহারই শিক্ষা এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কর্ম্মশক্তি এবং সাহসে কর্ত্তামহাশয়েরই অনুরূপ ছিলেন তিনি। পাঁচশত টাকা বেতনের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিলেন। ৺কাশীর সকলে তাঁহাকে "সাধু-বাবা" বলিয়া ডাকিত। সাধু হিসাবে ৺কাশীর মত জায়গায়ও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিল। এ হেন সাধুর অন্তরে ছিল কর্ত্তামহাশয়ের কর্ম্মস্পৃহা। উপযুক্ত কাজ জুটিল, সাধুগিরি ছাড়িয়া দিয়া "সাধু-বাবা" হইলেন মস্ত কর্ম্মী। ইহা কর্ত্তামহাশয়েরই শিক্ষার ফল।

একটা কোন কাজের কথা মাথায় উঠিলে কর্ত্তামহাশয় তৎসম্বন্ধে আশে-পাশের অনেকেরই মত লইতেন। দশজনের মত জানিয়া তারপর নিজে যাহা করিবার করিতেন। তিনি বলিতেন—"ঘটে ঘটে নিরঞ্জন।" মত জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কাহারও নিকট হইতে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ

অপরের মতামতে শ্রদ্ধা

পাইলে তিনি অত্যন্ত খুসী হইতেন এবং সময় ও সুযোগ পাইলে, সেই নির্দ্দেশকে রূপ দিতে যত্নবান হইতেন। ভাল কথা সহজে তিন ভুলিতেন না, সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতেন মাত্র। তাঁহার অন্তর যেমন সর্ব্বদা চারিদিক হইতে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য উন্মুখ ছিল তেমনি তিনি সকল কাজ লোক-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন।

দান সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত তিনি তাঁহার "দানবিধি" পুস্তিকায়, বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। দান এবং ঋণশোধকে তিনি সমপর্য্যায়ে রাখিতেন বলিয়া তাঁহার নিকট দান কথাটার কোন বিশেষত্ব ছিল না। তিনি দানকে ঋণশোধ বলিয়াই জানিতেন; সেজন্য তাঁহার নিকট দান ছিল কর্ত্তব্য, না করিলে অন্যায়, করিলে ঋণশোধ করা হইল মাত্র। দেশ ও সমাজ হইতে আমরা জন্মাবধি যে নানাবিধ উপকার প্রতিনিয়ত পাইতেছি তাহারই ঋণ আমরা দান দ্বারা শোধ করি। আমরা যে দেশে যে সমাজে জন্মগ্রহণ করি, যেখানকার আলো, বাতাস, জল আমরা প্রথম পাই, যে সমাজে যে স্থানে বাল্যে ধূলা-খেলা করিয়া বাড়িয়া উঠি সেই সমাজ ও সেই দেশের ঋণই আমাদের প্রথম ঋণ। সেখানকার ঋণই আমাদের প্রথম শোধ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়াই তিনি মনে করিতেন মানুষের দান-ধর্ম্ম যত কিছু সবই আরম্ভ করা উচিত নিজের গ্রাম ও নিজের সমাজ হইতে। Charity begins at home (স্বজনপ্রীতিই বিশ্বজনীন প্রেমের জনয়িত্রী)।

দান=ঋণশোধ

এইজন্যই দান এবং দোকানের চাকুরী বণ্টন সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র স্বজাতি, স্বগ্রাম, নিজের পরগণা এবং নিজের জেলাতে সীমাবদ্ধ রাখিয়া তিনি কাজ করিতে চেষ্টা করিতেন। সেজন্য কেহ

কেহ তাঁহাকে দোষারূপ করিয়া বলিত যে—তিনি নিজে ব্রাহ্মণ, তাঁহার সমস্ত দান ব্রাহ্মণ-সমাজেই নিবদ্ধ, তাঁহার বাড়ী ত্রিপুরা জিলায়, তাই তিনি কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে ত্রিপুরা জিলার লোকের প্রতিই পক্ষপাত করেন বেশী। দেশ-কাল-পাত্রের বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন, দরিদ্র, অসহায়, মুরুব্বীহীন স্ব-সমাজের ব্রাহ্মণরাই খাঁটি দানের পাত্র, তখন তাঁহাদিগের দিকেই তাঁহার চিন্তা ধাবিত হইল। একের সীমাবদ্ধ শক্তি দ্বারা সমস্ত দেশের সকলের দুঃখ দূর করা যখন অসম্ভব, তখন তাঁহাকে গণ্ডীরেখা ছোট করিয়া লইয়া ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইল। তাঁহাকে স্বজাতি পোষণকারী বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে বা কার্য্যে এমন কোন বিষয় কখনও প্রকাশ পায় নাই যাহাতে তাঁহাকে কেহ পর-জাতি বিদ্বেষকারী বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। বিটঘর গ্রামের কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, মালী, আচার্য্য, সূত্রধর, নাপিত—ইহাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। গণ্ডী ছোট করিয়া কিন্তু ভাল করিয়া কাজ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কাজের নিয়ম। এই কার্য্য-প্রণালী হইতেই স্বজাতি-পোষকতা-ধর্ম্মের সৃষ্টি। বস্তুতঃ ত্রিপুরা জিলায় এমন গ্রাম খুব কমই আছে, যে গ্রামের অন্ততঃ দুই-চারিজন ব্রাহ্মণ ছেলে বা যুবক কর্ত্তামহাশয়ের 'ঈশ্বর পাঠশালা', 'রামমালা ছাত্রাবাস', প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন না কোনটার সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা তিনি ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণ-সমাজের মতিগতি বর্ত্তমান কালোপযোগী করিবার জন্য যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

স্বজন ও স্বজাতিপ্রীতি

একদিন সহরের কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মুখে, কর্ত্তামহাশয়ের বিরুদ্ধে, তিনি স্বজাতিপোষক অভিযোগ শুনিয়া নিন্দাকারীর নাম উল্লেখ করিয়াই আমি কর্ত্তামহাশয়কে সকল কথা বলি। তদুত্তরে কর্ত্তামহাশয় বলিলেন, "তিনি সত্যই বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দোষ কি? আমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের পক্ষপাতী। তুমি তাঁহাকে বলিও, তিনি কায়স্থের জন্য একটা কিছু করিয়া কায়স্থ-পোষকতা দেখান, তাহাতে আমি খুসীই হইব। প্রত্যেকেই যদি এইরূপভাবে স্বজাতি ও স্ব-সমাজের জন্য কিছু করেন তবে তাহাতে মোটের উপর সমস্ত দেশেরই কাজ হইবে।"

সারাজীবন ভরিয়াই তিনি দান করিয়াছেন যথেষ্ট। হয়ত সময়ে তাহার বিভিন্ন মুখী দানের বিষয় এবং পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দানের তালিকা এবং অনুষ্ঠান সমূহের কর্ম্মসূচী প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাঁহার ভূরিদান বা কর্ম্ম-বাহুল্যের পশ্চাতে যে একটা বিরাট মন কাজ করিতেছিল, তাহার পরিচয় পাওয়ার সুযোগ সকলের পক্ষে খুব বেশী সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে আমি তাহাই এক আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

চিন্তা ও কর্ম্মের অভিনবত্ব

তিনি জীবনের শেষ ভাগে সুদূর বিন্ধ্যাচলে যাইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল সেখানে ছিলেন, সেখানে থাকিয়া সেখানকার আলো-বাতাস-জল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলেন। এই ঋণ তাঁহাকে শোধ করিতে হইবে, তাই তিনি সেখানে পুরাতন ভগ্নমন্দির মেরামত, রাস্তা প্রস্তুতকরণ, স্কুল প্রতিষ্ঠা, হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ, ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়া বহু টাকা ঋণশোধ করেন। তিনি বলিতেন—"রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভিক্ষুকের গান শুনিলেও

তাহাকে কিছু দিয়া না আসিলে, তোমাকে তাহার নিকট ঋণী থাকিতে হইবে। বিনা মূল্যে কোন কিছু উপভোগ করিলেই সেখানে তুমি ঋণী হইলে।"

একনিষ্ঠ ঈশ্বর-সেবক ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগকে দান করাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মনে করিতেন। কিন্তু সত্যকার ত্যাগী ঈশ্বরপরায়ণ সাধু সংসারে একান্তই বিরল। বিদ্যাদানকেই তিনি পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ দান মনে করিতেন তাহা ভাবিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। অজ্ঞানতাই সকল দুঃখ দুর্দ্দশার মূল এই উপলব্ধি হইতেই তিনি Education Charity Loan (শিক্ষা-ঋণ-দান ব্যবস্থা) আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি। খুচরা দান, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, ইত্যাদিতে দান, অপরিচিতকে দান অথবা অনিয়মিত দান তাঁহার প্রায় ছিল না। তবে শেষ বয়সে তাঁহাকে পথে খুচরা দান করিতে দেখিয়াছি। তিনি যখন বাহিরে যাইতেন তখন অন্ধ, খোঁড়া, অঙ্গহীন ভিক্ষুককে দান করিবার জন্য কিছু খুচরা পয়সা সঙ্গে রাখিতেন।

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বিবাহে লৌকিকতা সকলেই করিয়া থাকে। প্রায় সকলের কাজেই দেখিতে পাই একটা গতানুগতিকভাব। কিন্তু কর্ত্তামহাশয়ের সকল বিষয়েই যেমন মননশীলতা ছিল, এই সব সাধারণ ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই নাই। বর-কন্যাকে সৌখীন দ্রব্য বা মূল্যবান কাপড় না দিয়া, কিছুকাল নিত্য ব্যবহার করিতে পারে এমন বাসন-কোশন ইত্যাদি দিতে তিনি আমাদিগকে বলিতেন। আমার বড় মেয়ের বিবাহে তিনি টাকা-কাপড় ইত্যাদির দ্বারা লৌকিকতা না করিয়া কাঁসার বাসন দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে কোন বিবাহ উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন—"গরীবের বিবাহে কাপড় দিতে হইলে, বেশী

মূল্যের একখানা ঢাকাই সাড়ী না দিয়া, দুই-তিন জোড়া মোটা নিত্য ব্যবহারোপযোগী সাড়ী দেওয়া উচিত।”

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা মনে হইল। ঈশ্বর পাঠশালায় প্রতি বৎসর “ভীষ্মাষ্টমী-স্পোর্টস” নামে একটা প্রতিযোগিতামূলক খেলা হইয়া থাকে। সহরের সকল স্কুলের ছাত্ররাই ইহাতে যোগ দিয়া থাকে। এই সব প্রতিযোগিতা-পুরস্কারে সাধারণতঃ রূপার কাপ, মেডেল, ইত্যাদি দেওয়া হয়। কর্ত্তামহাশয় কাপ বা মেডেল কোন কাজে আসে না মনে করিয়া বাসন, আয়না, সুটকেশ, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করেন। কর্ত্তামহাশয় ছিলেন কাজের মানুষ, কাজের যাহা তাহাই সুন্দর, এই ছিল তাঁহার ধারণা।

এই সংসারে টাকার অভাবে অনেক সময় নির্য্যাতিত দুর্ব্বল হৃত-সর্ব্বস্বকে নীরবে আপন সম্পত্তি শত্রুকে ভোগ করিতে দেখিতে হয়। প্রতীকারের কোন পন্থা সে খুঁজিয়া পায় না। এমতস্থলে টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেওয়া তিনি বিশেষ পুণ্য কাজ বলিয়া মনে করিতেন। মোকদ্দমার টাকা যোগান দিয়া তিনি বিটঘরের হেমবাবুর সম্পত্তি ও রাধু সূত্রধরের সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। বিটঘরের শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য, ইব্রাহিমপুরের শ্রীযুক্ত সুরেশ ভট্টাচার্য্য, শ্যামগ্রামের শ্রীযুক্ত ফণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়দেরও মোকদ্দমা পরিচালনা করিবার টাকা তিনি যোগান দিয়াছিলেন বলিয়া জানি।

দানে গোপনতা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ভার তাঁহার জীবনচরিত লেখকের উপর ন্যস্ত রহিল। তিনি যে কতরকমে

কতদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার অতি নিকটতম জনও জানিতে পারেন নাই। Let not thy left hand know what thy right hand doeth (তোমার দক্ষিণ হস্তের কর্ম্ম বাম হস্তের নিকট গোপন রাখিবে)—বাইবেলের এই নীতি যেভাবে তিনি অনুসরণ করিতেন তাহা আমার মত লোকের কল্পনাতীত। একবার তাঁহার কোন বিশেষ দান কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইলে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে।" বস্তুতঃ "আত্মপ্রশংসা মৃত্যুতুল্য" এই শাস্ত্র বাক্য তিনি অন্তরে সত্য করিয়াই জানিতেন। দান না করিয়া দানের যশ লাভ করার কৌশল, অল্পদান করিয়া বহু প্রশংসা লাভ করিবার চেষ্টা—ইহাই ত আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। বড় লোক হইলে কোন কিছু দান না করিয়া চাঁদার খাতায় মোটা অঙ্কের পেছনে নাম সহি করিলেও খুব নাম হয় শুনিয়াছি। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে যে এই মহাপুরুষ এমন লোকাতীত শিক্ষা ও চরিত্রলাভ করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। দেশ-কাল-পাত্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়াই মহাপুরুষদের কার্য্য এবং বুদ্ধি চলে, ইহা এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতেছি। They are beggars that count their worth (যাঁহারা নিজের গুণের হিসাব করেন তাঁহারা নির্গুণ)—মহাকবি সেক্ষপিয়ারের এই অমূল্য কথা এখানে স্বতঃই মনে আসিতেছে।

দানে গোপনতা

আত্মপ্রশংসা মৃত্যুতুল্য

কর্ত্তামহাশয়ের দানে গোপনতা সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি জানি, পর পৃষ্ঠায় কয়েকটি উল্লেখ করিলাম।

তীর্থাদিতে, দেবমন্দিরে বা দেবস্থানের চত্বরে সাধারণতঃ দেখিতে পাই কয়েকটা সিঁড়ি বাঁধাইয়া দিয়া, অথবা একটা কোঠা তৈয়ার করিয়া দিয়া, কিম্বা চত্বরের খানিকটা অংশ পাকা করিয়া বা এমনি একটা কিছু কাজ করিয়া তাহাতে নিজের নাম খোদাই করা পাথর ইত্যাদি বসাইয়া নাম রক্ষার বন্দোবস্ত অনেকেই করেন। কর্ত্তা মহাশয় বিন্ধ্যাচলে থাকা কালে অষ্টভুজা বাড়ী হইতে কালীখো পর্য্যন্ত একটি রাস্তা করাইয়া দেন।

আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছা

অষ্টভুজা দেবীর বাড়ী, কালীখো কালীবাড়ী এবং নিকটবর্ত্তী আরও কোন কোন দেবস্থানের ভাঙ্গা অংশ মেরামতও তিনি করান; এই সব রাস্তা নির্ম্মাণ এবং মন্দির মেরামতাদি কার্য্য অনেক সময় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাজ-মজুর দ্বারা করাইয়াছেন, কিন্তু কখনও কোথাও নাম প্রকাশের জন্য কোন রকমের চিহ্ন রাখেন নাই।

৺গয়া "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের" জমির জন্য তিনি অনেক টাকা দেন। জমির চারিদিকের দেওয়ালটাও তিনিই করাইয়া দেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বাবুকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"বাড়ীঘর করিয়া দিলে নাম জাহির হয় বেশী। জমি, দেওয়াল ইত্যাদি দরকারী জিনিষ হইলেও ইহাদের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে না কিম্বা নামও বাহির হয় না। আমি সেজন্যই বাড়ীর জন্য টাকা না দিয়া জমি ও দেওয়ালের জন্য টাকা দিয়াছি।"

সীতাকুণ্ড তীর্থে ৺স্বয়ম্ভূনাথের বাড়ী হইতে ৺চন্দ্রনাথের বাড়ী যাইবার পথে খাড়া পাথরের কোন কোন অংশে তিনি সিঁড়ি করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমি অনেকবার ৺চন্দ্রনাথ তীর্থে গিয়াছি, স্মৃতিচিহ্ন বা নামের ফলক কোথাও না থাকায় তাঁহার

সেখানকার কাজের কোন পরিচয় আমি খোঁজ করিয়াও বাহির করিতে পারি নাই। এখানে আর একটি কথা মনে পড়িল—একবার মহামতি গোখলে প্রতিষ্ঠিত "সার্ভেণ্টস্‌-অফ-ইণ্ডিয়া-সোসাইটি" হইতে অর্থাভাব জানাইয়া এক আবেদন পত্র সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত হয়। কর্ত্তা-মহাশয়ের জনৈক বন্ধু কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে এই সমিতিতে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে কর্ত্তামহাশয় ঐ ভদ্রলোককে বলেন, "আমি কিছু দিতে পারি, কিন্তু দেখিবেন আমার নাম যেন প্রকাশ না পায়। আপনার নামে টাকাটা পাঠাইয়া দিলেই ত ভাল হয়।" এই কথার পর ভদ্রলোক স্বীকৃত হইলে, কর্ত্তামহাশয় তাঁহার বন্ধুর হাতে দুই হাজার টাকা দেন। ভদ্রলোক যথাসময়ে ঐ টাকা তাঁহার নিজ নামে "সার্ভেণ্টস্‌-অফ-ইণ্ডিয়া-সোসাইটি"তে পাঠাইয়া টাকা প্রাপ্তির রসিদ এবং ধন্যবাদ পত্র প্রাপ্ত হন। যাঁহার নামে টাকা পাঠান হইয়াছিল এবং যিনি ধন্যবাদ পত্র পাইয়াছিলেন তাঁহারই নিকট আমি এ কথা শুনিয়াছি।

ত্রিপুরা জেলার অন্তঃর্গত কসবা বিজনী নদীর উপর লৌহ-সেতুটি তিনি বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে করিয়া দিয়াছেন। একদিন কথায় কথায় কোন ভদ্রলোক কর্ত্তামহাশয়কে বলেন—"এই পুলের মাথায় আপনার নাম খোদাই করা একটি প্রস্তর ফলক থাকিলে ভাল হয়।" তাহার উত্তরে কর্ত্তামহাশয় বলেন,—"ইহার চেয়ে ভাল হয়, আমার কপালে যদি লিখিয়া দেন "পুল-নির্ম্মাণকারী মহেশচন্দ্র।" কর্ত্তামহাশয়ের 'দানে গোপনতা' সম্বন্ধে আর একটি আখ্যান এখানে বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। একবার কসবা হাই-স্কুলের টুল, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, ইত্যাদি সরঞ্জামের

জন্য টাকার বিশেষ দরকার হয়। তখন তথাকার উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী। উপেনবাবু কর্ত্তামহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে, কর্ত্তামহাশয় উপেনবাবুর হাতে এক হাজার টাকা দেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয় যে তিনি কর্ত্তামহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার দানের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। কর্ত্তামহাশয়ের মৃত্যুর পর আমি একথা জানিতে পারিয়াছি।

কর্ত্তামহাশয় উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে, বিহারের ভূমিকম্পে, পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষে বহু টাকা নিজের তত্ত্বাবধানে এবং 'রামকৃষ্ণমিশন', 'হিন্দু মিশন', 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে'র মারফৎ দান করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই যে দানে গোপনতা অবলম্বন করিতেন, তাঁহার এই সব বৃহৎ বৃহৎ সাময়িক দানেও দেখিতে পাই। তাঁহার নিজের কর্ম্মচারী অথবা রামকৃষ্ণ মিশন কিম্বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা লোক মারফৎ দান করিতেন, তাঁহাদের সকলের প্রতিই নির্দ্দেশ থাকিত, যেন তাঁহারা কিছুতেই দাতার নাম প্রকাশ না করেন। একবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মারফৎ এইরূপ কোন দানের কথা প্রকাশ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদের মারফৎ দান করা কিছু কালের জন্য বন্ধ রাখেন বলিয়া জানি। যদি নাম যশ অর্জ্জন আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার দানের উদ্দেশ্য হইত তবে তিনি নাম গোপন করিবার জন্য এত সতর্ক হইতেন না। কালধর্ম্ম গুণে তাঁহার দানের পদ্ধতিও অন্যপ্রকার হইয়া তাঁহার নামের পেছনে নানা প্রকার উপাধি যুক্ত হইত।

তাঁহার দানের গোপনতা সম্বন্ধে এমন কত কত কথা আমি জানি। কুমিল্লা, ৺কাশী, বিটঘর, কাইতলা, বিন্ধ্যাচল, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে

তাঁহার যে সকল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার কোনটাতেই কর্ত্তামহাশয়ের নাম প্রকাশ পায় এমন কোন চিহ্ন নাই। সীতাকুণ্ড—"গিরিশ ধর্ম্মশালা", কুমিল্লা—"নিবেদিতা স্কুল", প্রভৃতি নামেও তাহার আত্মগোপন চেষ্টা দেখিয়া চমৎকৃত হই।

কর্ত্তামহাশয়ের শেষ বয়সে আমাদের মধ্যে কোন একজন তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিতকথা আংশিকভাবে খবরের কাগজে তুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহাতে কর্ত্তামহাশয় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরস্ত করেন। তিনি বলিতেন—"জীবিত লোকের জীবন চরিত লেখা উচিৎ নহে; কেননা, মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের দোষ-গুণের যথার্থ ব্যাখ্যান চলে না।"

জীবনচরিত লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য

বড় লোকের ছোট-খাট কাজ করিয়া দিয়া খুসী করার প্রয়াস সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। বিনা আহ্বানে কর্ত্তামহাশয়ের কোন কাজ কেহ করিয়া দিলে তিনি বড় বিরক্ত হইতেন। খোসামোদ বা স্তোকবাক্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ এ সংসারে যশ-মান-খ্যাতি কেহ ইচ্ছা করিয়া পাইতে পারে না। ইহারা "যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত" (চৈতন্য চরিতামৃত)। "Bring your own lotus to bloom, the bees will come of themselves" [ম্যাটারলিঙ্ক] (অন্তর শতদল বিকশিত হইলে আপনা হইতেই ভ্রমর আসিয়া জুটিবে)।

স্তোকবাক্যে অশ্রদ্ধা

গ্রামের সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা প্রতীকার করিবার চেষ্টায় তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুবাবু। বাস্তবিক কর্ত্তামহাশয়ের অন্তর্নিহিত স্বগ্রাম এবং স্বসমাজ প্রীতিতে

কর্ম্মপ্রেরণা দিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি উপযুক্ত লোক সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কখনও কোন কাজে হাত দিতেন না। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুবাবুকে সহায়করূপে পাওয়ার পর হইতেই বিটঘর গ্রামের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রক্ষার সূত্রপাত হয়। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, বাড়ী, পুকুর, খাল, রিলিফ-ওয়ার্ক, দাতব্য ঔষধালয়, দীঘির পঙ্কোদ্ধার, বাড়ীর ক্রিয়া-কর্ম্ম, উৎসব, ইত্যাদি সকল ব্যাপারে জগদ্বন্ধুবাবুই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জগদ্বন্ধুবাবুর উৎসাহ ও সহায়তা না পাইলে বিটঘরে এত সব কাজ হইত কিনা সন্দেহ। কর্ত্তামহাশয়কে গ্রামের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করিয়াছেন জগদ্বন্ধুবাবু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিটঘর গ্রাম সংস্কারে জগদ্বন্ধুবাবুর সহায়তা

গ্রামে কাজের কথা উঠিলেই আমরা অনেক সময় শুনিয়া থাকি— গ্রাম বড় দুষ্ট জায়গা, গ্রামে কি কোন কাজ করিবার উপায় আছে? ঈর্ষা, দলাদলি, হিংসা-দ্বেষ, ইত্যাদিতে গ্রাম পরিপূর্ণ! একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা কর, দেখিতে পাইবে কিছুদিনের মধ্যেই তাহা নিয়া দেশে একটা দলাদলি সৃষ্টি হইয়াছে, কয়েক দিন পর স্কুলটি ধ্বংস হইবার পথে পড়িয়াছে। যদিইবা কোন রকমে টিকিয়া থাকিল, তাহার দশা হইবে প্লীহাগ্রস্ত রোগীর মত দুর্ব্বল। কিন্তু কর্ত্তামহাশয়ের বেলায় দেখি অন্যরূপ। কর্ত্তামহাশয়ের সকল কাজে গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-ভদ্রলোক, জমিদার, গরীব সাধারণ, হিন্দু-মুসলমান, প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর একপ্রাণতা, সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছেন প্রচুর। সে সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে গ্রামে কাজ করা অসম্ভব হইত।

নিঃস্বার্থ পল্লী-সংস্কারকের নিকট গ্রাম্য বাধাবিঘ্ন পঙ্গু

বিটঘরে তাঁহার দান ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার স্বার্থ করিয়া লইবার কিছু ছিল না। সেখানে তাঁহার দানই ছিল, তাঁহার আয়ের কিছু ছিল না। তাই সকলেই কর্ত্তামহাশয়ের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতিকর্ম্মে মনপ্রাণ ঢালিয়া সহযোগিতা করিয়াছেন। বিটঘরের রাস্তা-ঘাট-পুল নির্ম্মাণ, খাল-দীঘির পঙ্কোদ্ধার, ইত্যাদি করিতে গিয়া গ্রাম্য পলিটিক্সের দিক হইতে তিনি যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিবার লোক বিটঘরে এখনও অনেক আছে। সত্যকার ত্যাগশীলতা এবং নিস্পৃহতার আলোকে সমস্ত ঈর্ষা-দ্বেষ দলাদলি যে বিলীন হইয়া যায় তাহারই দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতেছি।

এখানে বিটঘরের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য মোক্তার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা উচিত মনে করি। কর্ত্তামহাশয়কে স্বগ্রামমুখী করিয়া গ্রামের কাজে নিযুক্ত করা ব্যাপারে ৺কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে বলিয়া আমি জানি।

পরোপকারেচ্ছা কর্ত্তামহাশয়ের হৃদয়ে ছিল স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এবং অত্যন্ত প্রবল—ইহা আমরা তাঁহার কথাবার্ত্তা চালচলন এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ-কর্ম্মের ভঙ্গীতে সর্ব্বদাই দেখিয়াছি।

পরোপকার

এখানে একটা কথা মনে হইল। বিটঘর গ্রামের প্রায় চারিদিকেই জল। তখন কার্ত্তিক মাস, নিকটবর্ত্তী মাঠের জল প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে; গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী নৌকাদাড়াগুলি (নৌকা চলিবার রাস্তা) প্রায় সবই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিলেব দূরের রাস্তা এখনও খোলা। এমন একদিন কর্ত্তামহাশয় তাঁহার পুকুর পাড়ের খোলা 'হাওয়া-ঘরে' গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

হইতে আগত দুই জন সম্ভ্রান্ত উকিল বাবুও সেখানে তখন উপাস্থিত। আলাপ-আলোচনা চলিতেছে এমন সময় হঠাৎ তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, উঠিলেন এবং মাঠের কোণ পর্য্যন্ত যাইয়া একটা ডিঙ্গি নৌকার মাঝিকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ও মাঝি, ও মাঝি, এদিকে আসিও না, এই নৌকা-দাড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আসিলে বাহির হইতে পারিবে না", ইত্যাদি। কার্ত্তিক মাসে বিটঘরের মত বিলান অঞ্চলে নৌকার মাঝিরা রাস্তা ফেলিয়া ভুল পথে আসিয়া যে বিপদে পড়ে তাহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এতগুলি ভদ্রলোকের দরকার এবং আলোচনা ফেলিয়া মাঝির উপকার করিতে গিয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকেরা ত তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। চক্ষের সাম্নে একটা লোক রাস্তা ফেলিয়া বিপথে চলিয়া কষ্ট পাইবে ইহা তাঁহার মনে হওয়ামাত্র তিনি স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া মাঝিকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজটা অতি সামান্য, মাঝির কষ্ট হইলেই বা কত কষ্ট হইত ; উহারা কার্ত্তিক মাসে রোজই ত এমন কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু কর্ত্তামহাশয়ের এত কথা ভাবিবার বা খতিয়ান করিয়া দেখিবার একটুও অবসর ছিল না। সম্মুখে কাজ উপস্থিত, তখনই ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, তাহাই তিনি করিয়াছিলেন। ইহাই মহতের লক্ষণ।

সারাজীবনই কর্ত্তামহশয়ের গায়ে দেখিয়াছি একটা হাতকাটা ফতুয়া। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেও তাঁহার গায়ে একটা গরম কাপড়ের ফতুয়া ছিল। ফতুয়াটা পুরাতন ও জীর্ণ হওয়ায় তালি দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে নীচের লাইনিংটাও ছিড়িয়া যাওয়ায় হাতের দিকের কতকটা অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জামাটা বদলাইবার কথা হইলে

বলিতেন—"আর কয় দিনই বা আছি উহা বদলাইয়া লাভ কি, কোন মতে চলিয়া গেলেই হইল।" শেষে নীচের কাপডটা ঝুলিয়া পড়ায় যখন বাস্তবিকই অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন, তখন একদিন পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা আমার পিডানটায় অসুবিধা হইতেছে, লাইনিংটা সেলাই করিয়া ঠিক্ ঠাক্ করিয়া দিতে পার? একটা পুরাতন কাপড দিয়া যেমন তেমন ভাবে দিলেই চলিবে—কয়দিন আর বাঁচিব, আর একটা নূতন করিয়া লাভ কি? অনর্থক কয়েকটা টাকা খরচ হইবে।" বৌমা জামাটা নিয়া নিজেই একটা নূতন কাপড নীচে দিয়া তাঁব বুদ্ধি এবং সাধ্যমত মেরামত করিয়া কর্ত্তামহাশয়ের কাছে লইয়া গেলে তিনি অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন—"জামাটা বেশ চমৎকার হইয়াছে। বেশী দিন ত নয়! যে কয়দিন আছি, বেশ চলিয়া যাইবে। আমি যে একটা নূতন কিনিতে না পারি তা নয়, একটা নূতন কিনিলে টাকাটা লোকসান হইত।" এই বলিয়া পায়ের ছেডা মৌজাটা বৌমাব হাতে দিযা বলিলেন—"দেখ মা, এই মৌজাটার কিছু কবিতে পার কিনা—মেরামত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়. কয়দিনেব জন্য তিন টাকা দিয়া এক জোডা মৌজা কিনিয়া কি হইবে? দেশের কত গরীব দুঃখী না খাইতে পাইয়া মবিয়া যাইতেছে আর আমি এক জোডা মৌজা কিনিয়া বৃথা পয়সা নষ্ট করিব? এটা একটু মেবামত করিয়া দিলেও ত চলিবে।" বৌমা মৌজা জোডা নিয়া মেরামত করিয়া দিলেন, কিন্তু মৌজা জোডা অত্যন্ত ছেঁডা ছিল বলিয়া একটু বেশী কুচ্‌কাইয়া গিযাছিল। তাহাই হাতে লইয়া কর্ত্তামহাশয় আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন—"মা, তুমি সুখে থাক। এই জামাটা এবং

দেশব্যাপী দুঃখ দৈন্যেব বেদনায় আমৃত্যু ভোগে অনাসক্তি

মৌজা জোড়া কিনিতে হইলে আমার অনেক টাকা লাগিত, আট-দশ টাকার কমে হইত না। তুমি কিছু টাকা নেও আর তোমার স্বাধীন ইচ্ছা মত গরীব দুঃখীদের দান কর। কত টাকা দিব? পাঁচ টাকা না দশ টাকা?" বৌমা উত্তর করিলেন—"দশ টাকা"। কর্ত্তামহাশয় খুব খুসী হইয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমার মনটা খুব ভাল, দান করিতে হইলে আকাঙ্ক্ষাটা উপর দিকে চলে, তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব। ইহা তুমি ইচ্ছামত দান করিও, কেহ তোমাকে কিছু প্রশ্ন করিবে না, আমাকেও বলিবার আবশ্যক নাই।" জানিনা এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক কাহিনী, শ্বশুর পুত্রবধূর আলাপ-ব্যবহার এবং কাজ-কর্ম্ম সকলের নিকট উপাদেয় হইবে কিনা। আমার নিকট কিন্তু এসব কথাও পুণ্যকথার মত মনে হইতেছে। তাই আমি ঘটনাটা এত বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম। এই ঘটনাদ্বারা তাঁহার পরোপকারেচ্ছা যে কিরূপ তীব্র ছিল তাহা যেমন একদিকে বুঝিতে পারি, আবার পরিবারের সকলেই যেন দানধর্ম্ম শিক্ষা পায় তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সজাগ বুদ্ধির পরিচয় পাই।

কর্ত্তামহাশয় ছিলেন স্বাবলম্বী পুরুষ, "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং" ইহাকেই তিনি করিয়াছেন তাঁহার প্রাণপ্রিয় 'রামমালা ছাত্রাবাসে'র মূলমন্ত্র (Motto)। আইন করিয়া যেমন তিনি প্রয়োগ করিতেন সর্ব্ব প্রথম নিজের উপর, এই মূল মন্ত্রের সাধনাও করিয়াছিলেন প্রথম তিনি নিজে।

বিলাসবর্জ্জিত স্বাবলম্বন

কর্ত্তামহাশয় যখন বেশ একটু অবস্থাপন্ন হইয়াছেন তখনও আমি তাঁহাকে নিজের ছোট-খাট অনেক কাজ নিজেকেই করিতে দেখিয়াছি। তিনি সহজে কাহাকেও কোন ফরমাইস করিতেন না। যতটুকু পারিতেন নিজেই করিতেন। যাহা নিজে করা সম্ভব হইবেনা

মনে হইত তাহা বাদ দিয়াই চলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভাব এবং সেবাগ্রহণের আবশ্যকতাটাকে অত্যন্ত কমাইয়া চলিতেন দেখিয়া আমার মাঝে মাঝে কবি গোল্ডস্মিথের Man wants but little here below (এই পৃথিবীতে মানুষের ভোগের জন্য অতি সামান্যই প্রয়োজন হয়) কথাটা মনে হইত। সারাজীবন কবিতা, সাহিত্য, ইত্যাদি মুখস্থ করিয়া যে সত্যের এক কণিকাও আমাদের আয়ত্ত হইল না তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষাহীন এই মহাপুরুষের রক্তে-মাংসে মিলিয়া গেল কি করিয়া তাহাই ভাবি!

'স্বাবলম্বন' কথাটা কর্ত্তামহাশয়ের চিত্তে এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আমেরিকার নিগ্রো কর্ম্মবীর 'বুকার-টি-ওয়াশিংটনে'র জীবন চরিত "ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী" নামে বাংলায় অনুবাদ করাইয়া একবার কুমিল্লা সহরেব সমস্ত হাই-স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

দরিদ্রদেশে, দরিদ্রসমাজে বিলাসিতার মত সর্ব্বনাশকারী পাপ আর নাই। বিলাস আকাঙ্ক্ষা হইতে প্রথমে সমাজবন্ধন শিথিল হয়, তারপর সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ঢুকিয়া নানাবিধ পাপ এবং ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। চতুর বিদেশী বিজেতারা এই বিলাসিতা এবং শান্তিপ্রিয়তার ফাঁস দিয়াই পরাজিত শক্তিহীন জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। কর্ত্তামহাশয় ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াই দেশে অন্ততঃ গুটিকয়েক স্বাবলম্বী, শক্ত, সবল, সুগঠিত, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান, ধর্ম্মপরায়ণ ছেলে গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া 'রামমালা ছাত্রাবাসে'র পত্তন করেন।

পরমুখাপেক্ষী না হওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—এই ছিল তাঁহার অভিমত। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন রামমালা ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগকে তাহাদিগের প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিজের হাতে করিয়া লইতে হইবে। সেখানে হাটবাজার, জল-মসল্লা, কুট্না কুটা, রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর লেপা, প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য ছেলেদিগকে নিজের হাতে করিতে হয়। ধোপা দ্বারা কাপড় কাচান বা নাপিত দ্বারা চুল ছাটাইবার নিয়ম নাই। ছেলেরা প্রতি রবিবারে নিজেদের কাপড় নিজেরাই কাচে এবং একজন আর একজনের চুল ছাটিয়া দেয়। শাক-সব্জী, ফল-ফলারি, ইত্যাদি ছেলেরা নিজেরাই করে। পুকুরের মাছও ছেলেরা নিজেরাই ধরে, সেজন্য তাহাদিগকে জাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের দৈনিক কর্ম্ম তালিকায় বাড়ীঘর, উঠান, রাস্তাঘাট, নর্দ্দমা, ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" নীতি যাহাতে রামমালার ছাত্রদের আওড়ান বুলিমাত্র না হইয়া হৃদয়ে বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয় তাহাই তাঁহার অন্তরের একান্ত কামনা ছিল। শ্রমের মর্য্যাদার (Dignity of labour) প্রচার এবং সাধনা যাহাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মিথ্যা অর্থহীন মান-সম্মানের খোলস দূর হয় তাহাই ছিল তাঁহার রামমালা ছাত্রাবাসের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

রামমালা ছাত্রাবাসের শিক্ষা-প্রণালী

ঈশ্বর পাঠশালা সম্বন্ধে আলাপকালে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"স্কুল করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। রামমালা ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা অন্য স্কুলে পড়িলে রামমালার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে পারে ইহা আমি আশঙ্কা করি বলিয়াই তাহাদের প্রয়োজনে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা।

রামমালার জন্য স্কুল, স্কুলের জন্য রামমালা নহে।" স্কুল করিতে হইলে কেবলমাত্র স্কুল না করিয়া আবাসিক (residential) স্কুল করাই দরকার—ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত।

শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তামহাশয়ের ধারণা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সাধারণতঃ দেখা যায় কোন উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের দেশের ছেলেরা পড়াশুনা করে না। আর কিছু পায় না বলিয়াই ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ঢুকে,—আই-এ ও বি-এ পাশ করে। তারপর কি করিবে তাহা তাহারা নিজেরাও জানে না বা তা'দের অভিভাবকেরাও জানেন না। বি-এ পাশ করার পর লক্ষ্যবিহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া নানাদিকে ব্যর্থ হইয়া নৈরাশ্যের অবসাদে যাহা কিছু হাতের কাছে পায় তাহাই ধরিতে চেষ্টা করে; কিন্তু দুর্ব্বল অবসন্ন হস্ত কিছুই দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারে না। অনেক সময়েই নূতন অবস্থার সহিত পুরাতন শিক্ষার সঙ্গতি থাকে না, ফলে পুরাতন শিক্ষার অর্থ এবং সময় নিষ্ফল হয়। নূতনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া জীবনও দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। দেশে শিক্ষার এই দুরবস্থা দেখিয়াই কর্ত্তামহাশয়ের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে দেশের সর্ব্বসাধারণের জন্য এই উদ্দেশ্যবিহীন কলেজী-শিক্ষা একান্তই অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকর। সাধারণ শিক্ষার সহিত কারিগরী এবং ব্যবহারিক শিক্ষা যুক্ত হওয়া অত্যন্ত দরকার মনে করিয়া তিনি রামমালা ছাত্রাবাসে দোকান, কৃষিশিক্ষা, বাঁশবেতের কাজ, সূতাকাটা, ইত্যাদি কাজের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মধ্য-ইংরেজী পর্য্যন্ত পড়া দেশের ছোট বড় সকলেরই

প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত

অবশ্য কর্ত্তব্য। জাতি গঠনে দেশে অতি ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা উপলব্ধি করিয়াই কর্ত্তামহাশয় বিটঘর এবং তাহার চারিপাশের কতকগুলি গ্রামের প্রায় চল্লিশটি স্কুল লইয়া "বিটঘর শিক্ষা-সংসদ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত বহুদিন পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরে দেশের নানা স্থানে সরকারী ফ্রি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঐ সংসদের গণ্ডী কমাইয়া অল্প কয়েকটি স্কুলে নিবদ্ধ করিয়া এখনও তাহা চলিতেছে।

বিটঘর শিক্ষা-সংসদ

যেসব ধনীসন্তানের যথেষ্ট টাকা এবং সময় ব্যয় করিবার সুযোগ আছে তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যত্নবান হইতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের যাহাদের নানা প্রকার কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে তাহাদের ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়া অন্য কোন লাইন ধরা উচিত। দরিদ্র অথচ বিশেষ মেধাবী ছাত্রেরও উচ্চশিক্ষার দরকার কিন্তু তাহার শিক্ষার ভার দেশের বড় লোক কিম্বা সরকারের (State) নিতে হইবে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই কর্ত্তামহাশয়ের রামমালা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। কেবলমাত্র Art Classes (কলা বিভাগ) খুলিয়া দেশে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কুমিল্লা 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠাকালে কুমিল্লার বিশিষ্ট নাগরিকগণ চাঁদার জন্য কর্ত্তামহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি চাঁদা দিতে সম্মত হন নাই।

উচ্চশিক্ষার অধিকারী সম্পর্কে মতামত

বর্ত্তমানে দেশের তপশীল শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের জন্য গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা স্থানে বোর্ডিং প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই সকল শ্রেণীর ছাত্রদের থাওয়া-থাকার জায়গার অভাবে পড়াশুনা হইত না। কর্ত্তামহাশয় এই অসুবিধা দেখিয়া তাঁহার রামমালা ছাত্রাবাসে মালী, চামার, নমঃশূদ্র, প্রভৃতি জাতির কয়েকটি ছাত্রকে স্থান দিয়াছিলেন। এখন রামমালা ছাত্রাবাসে অস্পৃশ্যতার কোনও স্থান নাই।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পূর্ব্বদিকে বিলের মধ্যে অবস্থিত দত্তখলা অঞ্চলের নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য কলিকাতা "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে"র রায় সাহেব ৺রাজমোহন দাস মহাশয়ের সহায়তায় কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ১৩২২-২৩ বাং সনের কথা হইবে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে কয়েকটা স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল।

শেষ বয়সে তাঁহার বড় রকমের একটা টেকনিক্যাল স্কুল করিবার আকাঙ্ক্ষা হইযাছিল। তখন সাধারণ শিক্ষার (General education) প্রতি তাঁহার আস্থা খুবই কমিয়া গিয়াছিল মনে হয়। একটা টেকনিক্যাল স্কুল করিতে হইলে বিপুল অর্থ এবং বিরাট কর্ম্মশক্তির প্রয়োজন। কর্ত্তামহাশয়ের বয়স হইয়াছে, অর্থশক্তিও তেমন অপরিমেয় নয়। একের পক্ষে এত বড় কাজ করাও তিনি অসম্ভব মনে করেন। তাই তিনি আমাদের জিলার উদীয়মান শক্তি "লেবার-হাউসে"র শ্রীযুক্ত প্রবোধ চক্রবর্ত্তীকে একটা টেকনিক্যাল স্কুল করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার শেষকালের এই আকাঙ্ক্ষা

শিল্প-শিক্ষা

কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যোগে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন-সারদাপীঠে "মহেশচন্দ্র মিকানিক্যাল সেক্‌শন" নামে একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে।

শিক্ষক সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি সুস্পষ্ট ছিল। তিনি বলিতেন—

শিক্ষক

শিক্ষক হইবেন শরীরে মনে সুস্থ, আদর্শ চরিত্র, বিলাস-বর্জ্জিত, দেশহিতব্রতী ও ত্যাগী। তাঁহারা চিরকুমার, সংসার বন্ধনহীন, ও একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী হইলে আরও ভাল। আর কিছু করিতে না পারিয়া ঠেকিয়া শিক্ষক হওয়াকে তিনি দেশের ও সমাজের অতি বড় দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন।

জ্বলন্ত কয়লাব টুকরা লইয়া ইঞ্জিনে আগুন দিতে হয়। জ্বলন্ত কয়লা না হইলে ইঞ্জিনে আগুন ধরিবে কি প্রকারে? ছেলের প্রাণে উদ্দীপনা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের বহ্নি যে না জ্বালিতে পারিল সে ত শিক্ষক নামেরই যোগ্য হইতে পাবে না। মিথ্যা ফাঁকা আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ত কোন কাজ হয় না। আশা আকাঙ্ক্ষাকে সত্যরূপ দিতে হইলে চাই অদম্য কর্ম্মশক্তি, সবল দেহ, সুগঠিত চরিত্র, দৃঢ় মন ও বুদ্ধি। এই সবের অনুপ্রেরণা দিয়া শিক্ষককে গড়িতে হইবে ছাত্র। সেজন্য তাঁহার নিজেকেই হইতে হইবে আদর্শ ত্যাগী সন্ন্যাসী, তাহা না হইলে কি কেহ তেমন শিক্ষক হইতে পারে?

স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলিয়াছিলেন—"বেশী নয় আমাকে এক হাজার শিক্ষিত, ত্যাগী, অবিবাহিত যুবক দেও, আমি দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষকে ওলট-পালট করিয়া ফেলিব"। স্বামীজির এই কথাই যেন কর্ত্তামহাশয়ের কার্য্য প্রণালী এবং চিন্তাধারা দিয়া

প্রকাশ পাইতেছে এবং তাঁহার প্রাণ-প্রিয় রামমালার মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাঁহার মত ছিল অত্যন্ত উদার—ইহা বিধবা বিবাহ ব্যাপারেই বুঝিতে পারি। কিন্তু যে কোন কাজে বিরাট আড়ম্বর কিম্বা জাঁকজমক করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই তিনি সমাজ সংস্কার বিষয়েও প্রথমেই আমূল পরিবর্ত্তন অথবা একান্ত ভাঙ্গাগড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজ-সংস্কার কার্য্যে চরম পন্থা বা তড়িৎ গতির পরিবর্ত্তে ধৈর্য্য ও সহনশীল মনোবৃত্তি লইয়া প্রচার ও সংগঠন আবশ্যক ইহা তিনি জানিতেন।

সমাজ সংস্কার

অধুনা প্রচলিত ছুঁৎমার্গ তিনি পছন্দ করিতেন না। তবে সমাজের মৌলিক রীতি-নীতিতে হাত না দিয়া সমাজের শ্রেণী বিশেষের দলাদলি ভাঙ্গিয়া কাজ করাই তাঁহার পদ্ধতি ছিল। বিটঘর গ্রামের পাকরাশীদের সঙ্গে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর একত্র ভোজনের প্রথা নাই। চক্রবর্ত্তীদের লইয়া সমস্ত গ্রামে একটা ব্রাহ্মণ সমাজ হউক, সেজন্য কর্ত্তামহাশয় একবার বিশেষ চেষ্টা করেন। গ্রামের নূতন পন্থীরাও তাঁহার সহিত একমত ছিল। কিন্তু কি জানি কেন তাহা হইয়া উঠে নাই। কিন্তু কর্ত্তামহাশয় প্রতি বৎসরই ৺দুর্গা পূজার সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া খাওয়াইতেন।

আঘাত দিয়া না ভাঙ্গিয়া ক্রমে ক্রমে কুসংস্কারগুলি শুধরাইয়া দিবার আয়োজন করাই ছিল তাঁহার সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি। ছুঁৎমার্গ সম্বন্ধেও তাঁহার এই পদ্ধতি আমরা রামমালা ছাত্রাবাস এবং নিবেদিতা ছাত্রীনিবাসে দেখিয়াছি। বাংলাদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ এক হউক ,

এই সমাজের ভিতরকার শ্রেণীবিভাগ চলিয়া যাউক, তাহা তিনি অন্তরের সহিত কামনা করিতেন। একবার কুমিল্লাতে মুখোপাধ্যায় বংশজাত একটি কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত আমাদের জিলার এক শ্রোত্রিয় যুবকের বিবাহ হয়। কর্ত্তামহাশয় এই খবর পাইয়া এত খুসী হন যে, তিনি কন্যার ভাইকে আহ্বান করিয়া বাড়ীতে আনিয়া তাহার কাছে নিজের আনন্দ প্রকাশ করেন।

সমাজ সংস্কার বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক কর্ম্মপন্থা; কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে পণ প্রথার নির্ম্মম অত্যাচার তাঁহার মনকে এত অভিভূত করিয়াছিল যে, তিনি এই ক্ষেত্রে উক্ত কুখ্যাত প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। পণ প্রথার কথা মনে হইলেই তাঁহার অন্তরে এক উন্মত্ত বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে বিশেষ বিচলিত করিত। একদিকে সমাজে বিধবাদের দুর্দ্দশা, দুর্গতি, অন্যদিকে কুমারী বিবাহে পণ প্রথা এই দুই মিলিয়া বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে যে কতদিকে কত হীনতা এবং দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তিনি পরিষ্কার রূপেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। পণ প্রথার অন্তরালে যে নারীজাতির প্রতি সমাজের একটা প্রকাণ্ড অসম্মান এবং অবজ্ঞা লুক্কায়িত আছে তাহা মনে করিয়া তিনি অন্তরে খুবই বেদনা পাইতেন। পণ প্রথা রহিত কবিবার জন্য কত সভাসমিতি, বক্তৃতা, আন্দোলন দেশে হইল, কিন্তু ফলে কি হইল এবং কি হইতেছে তাহাও বুঝি না। পুণ্যাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বলিদান" নাটক দেখিয়া কতশত জনকে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছি,—ভাবপ্রবণতা এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারাই আমাদের সব কাজ শেষ হইল। সত্য বলিতে গেলে সমাজ দেহের

এই কদর্য্য রোগ দিন দিনই ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানের কঠোর জীবন-সংগ্রাম এবং অন্ন সমস্যাও ইহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে। কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া কর্ত্তামহাশয় মনে করিলেন, পুরাতন সংস্কার-মুগ্ধ পিতামাতা বা অভিভাবকগণের নিকট আবেদন না করিয়া দেশের ছেলে মেয়েদিগকে তাহাদের এই গ্লানি এবং অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। ঈশ্বর পাঠশালার দশম শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া বিবাহে পণের আদান প্রদান যে সমাজের পক্ষে কত গর্হিত কার্য্য তাহা বুঝিয়া তাহারা নিজেরাই যেন এই প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয, তাহাব জন্য বদ্ধপরিকর হইযা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করিতে উপদেশ দেন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি রামমালা ছাত্রাবাসের ছাত্র এবং ঈশ্বর পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে তাহাদের ভর্ত্তিব সময় এইরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহাদের বিবাহে পণের আদান-প্রদান হইতে পারিবে না। অভিভাবককেও ঐ মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

যে বিবাহে পণের আদান-প্রদান হইত সেই বিবাহে তিনি উপস্থিত থাকিতেন না। লেখাপড়া জানা বা পাশকরা মেয়েরা কেহ তাঁহার সহিত দেখা কবিতে গেলে তিনি প্রায়ই বলিতেন—"দেখ মা, তোমরা দলবাঁধ, বিবাহে পণের আদান-প্রদানের কথা হইলে সেই বিবাহ তোমরা মানিয়া নিবে না, এই কথা জোর করিয়া বল। তোমাদের কতজনের বাপ-মা পণ দিয়া মেয়ে বিবাহ দিতে গিয়া বাডীঘর বেচিয়া যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন তাহা তোমরা দেখিতেছ। তোমরা ছেলে-মেয়েরা যদি

নিজের হাতে এই গ্লানি এবং অপমান দূর করিতে চেষ্টা না কর তবে এ পাপ সমাজ হইতে দূর হইবে না।"

প্রত্যেকের আপন আপন সমাজে সঙ্ঘশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ শক্তিশালী হৌক কর্ত্তামহাশয় ইহা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেন। বিটঘর ব্রাহ্মণ সমাজ গরীব এবং পরমুখাপেক্ষী—ইহা তিনি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইতেন ইহা মনে করিবার হেতু আছে। তাই তিনি তাঁহার নিজের ব্রাহ্মণ সমাজ যাহাতে সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করেন। কোন উৎসব, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে আসন, বাসন প্রভৃতি সামান্য সামান্য জিনিষও অন্যস্থান হইতে আনিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। কর্ত্তামহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিটঘর ব্রাহ্মণ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার উদ্যোগে বাসন ও আসবাবপত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পাড়ার অসুবিধা বহুলাংশে দূর হইয়াছে। এ বিষয়ে কবিরাজ ৺শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৺কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য মোক্তার, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণের সাহায্য এবং উৎসাহের কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই বিটঘর ব্রাহ্মণ-সভা সম্প্রতি বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উৎসব ইত্যাদিতে এবং ছোটখাট আরও অনেক বিষয়েই বিটঘর ব্রাহ্মণ সমাজকে স্বাবলম্বী করিয়াছে। অনেক গ্রামেই দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনটা দল, তিনটা সমাজ, এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের খাওয়া দাওয়া নাই, ইত্যাদি। কিন্তু অত্যন্ত গৌরবের বিষয় গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেও বিটঘর গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন

বিটঘর ব্রাহ্মণ সমাজ

দলাদলি হইয়াছে বলিয়া জানি না। আর এক কথা, দরিদ্র বিত্তহীন ব্রাহ্মণ সমাজের যুবক শ্রেণীর লোকেরা আজ শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থোপার্জ্জন এবং বিদেশে যাইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেমন কৃতিত্ব দেখাইতেছে তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হয়। বিটঘর ব্রাহ্মণ সমাজের এই স্বাবলম্বন আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন জাগ্রত বুদ্ধি এবং রুচি কোথা হইতে আসিল এবং কর্ত্তামহাশয়ের কোন প্রভাব ইহাতে আছে কিনা তাহা বিটঘর বাসীরাই ভাল করিয়া বলিতে পারেন।

শেষ বয়সে ৺কাশী অবস্থান সময়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, ৺কাশীতে ত্রিপুরার বাঙ্গালী কয়েক ঘর বেশ একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কোন সমাজ বন্ধন অথবা সঙ্ঘশক্তির কোন আভাস নাই। ৺কাশীবাসী শ্রীহট্টীয়দের অবস্থাও সেইরূপ। বিচ্ছিন্ন ভাবে যাহার যেমন সুবিধা তেমন ভাবে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে; সামাজিক জীবন নাই বলিলেই চলে। আচার নিয়ম, সামাজিক বন্ধন, বিবাহাদি, ভাষা, চালচলন ইত্যাদিতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহট্ট ত্রিপুরারই অনুরূপ। ৺কাশীবাসী এই দুই জিলার লোকদের লইয়া একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা সঙ্ঘবদ্ধভাব আনিতে পারিলে ৺কাশীর মত বিদেশেও শ্রীহট্ট-ত্রিপুরার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এই আশায় কর্ত্তামহাশয় "শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা সম্মিলনী" নাম দিয়া একটী সমাজ গঠন করেন। সমাজ হইতে গেলেই কতগুলি উৎসব অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়া এবং পরস্পর মিলা-মিশার আয়োজন করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা সম্মিলনী কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর ৺বাসন্তী পূজা হইবে এই ব্যবস্থা করা হয়। কর্ত্তামহাশয়ের

৺কাশীতে শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা সম্মিলনী

ধর্ম্মশালাই সম্মিলনীর বৈঠকস্থান এবং অফিসঘর হইল। ৺বাসন্তী পূজা ইত্যাদি উৎসবের জন্য ধর্ম্মশালায় পূজার মন্দির ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এই ব্যবস্থা হয়। এই উৎসবের নিয়ম হইল শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরা জিলার সকল লোকই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবে, সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর্ম্ম করিবে এবং প্রসাদ পাইবে। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই চাঁদা দিবে এবং অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় ঘাটতি অংশ পূরণ করিবেন কর্ত্তামহাশয়। সুখের বিষয় শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা সম্মিলনী উক্ত উৎসব এখনও চালাইয়া আসিতেছে। আমি কোনও এক উপলক্ষ্যে হরসুন্দরী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত থাকিয়া এই দুই জিলার লোকদের মধ্যে মিলনশক্তি জনিত যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়াছি তাহাতে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। এই বিদেশে একটা উৎসব উপলক্ষ্যে এতগুলি আত্মীয় অনাত্মীয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া প্রাণে একটা অভূতপূর্ব্ব আশা ও আনন্দ পাইয়াছিলাম।

অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা

কর্ত্তামহাশয়ের জীবনযাত্রা প্রণালী, পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন সবই ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের ও সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন। কিন্তু সাদাসিধা এই আড়ম্বর হীনতার মধ্যে এমন একটা সৌষ্ঠব এবং শালীনতা মিশান ছিল যে তাঁহার এই আড়ম্বর হীনতাতেই সকলে মুগ্ধ হইত। পোষাক ছিল অতি সাধারণ, কিন্তু গোছগাছ, পরিপাটি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ছিল অতুলনীয়। কোথাও সামান্য মাত্রও নোংরামীর ছায়া দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মিতব্যয়িতার দিক দিয়াও বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত ছিল। আজকাল ৮।৪৪ বা ৯।৪৪ ধুতির আমদানী হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে ৪৪ ইঞ্চি বহরের ধুতি ১০ হাতের কম হইত না।

তখনকার দিনেও রেলীর উনপঞ্চাশ থানের আধথান (২০ গজ) কিনিয়া আটহাতি পাঁচখানা ধুতি করিয়া লইয়া কর্ত্তামহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছি—"আমার একখানা ধুতি বেশী হইল"। সাবান, এসেন্স, সুগন্ধি ইত্যাদি প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহার তিনি কখনও করেন নাই। কেশ বিন্যাসের জন্য চিরুণীও ব্যবহার করিতেন না। চুল সর্ব্বদা খাট করিয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন—"স্নানের পরে হাতের আঙ্গুল দিয়া চুলগুলিকে একটু ভাঁজ করিলেই হয়।"

স্বেচ্ছাচারী পরিচ্ছদ বিলাসে দুঃখ

আজকাল পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে একটা শিথিল খামখেয়ালী ভাব দেখিতে পাই। ছেলেদের মধ্যে দেখি অনেকে যেন কাপড় পরিতেই জানে না। অনেক পরিবারে আবার দেখিতে পাই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে বাপ মা আহ্লাদ করিয়া নানা ঢংএর পোষাক, পেশোয়ারী পোষাক, মেয়েদিগকে পুরুষের সার্ট, কোট ইত্যাদি পরাইয়া আনন্দ পান। পোষাক পরিচ্ছদের এই অনাবশ্যক খামখেয়ালী, যুক্তিহীন পরানুকরণ প্রবৃত্তি দেখিয়া কর্ত্তামহাশয় খুবই দুঃখ পাইতেন। একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয়তাবোধ অথবা সমাজ বন্ধন নাই বলিয়াই পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নিজেরা স্বেচ্ছাচারী এবং ছেলেমেয়েদেরও স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছে। দেশের রাজ-ব্যবস্থায় পোষাক পরিচ্ছদেরও আইন কানুন সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।" ঈশ্বর পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে একটা বিশেষ রকমের পোষাক (uniform) পরিবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা ইহাও এক সময়ে কর্ত্তামহাশয়ের চিন্তার মধ্যে ছিল বলিয়া জানি।

তাঁহার সাদাসিধা জীবনযাত্রা প্রণালীতে আসবাবপত্রের বালাই খুব কমই ছিল। মেছ বা বোর্ডিংএ যেমন প্রত্যেক ছেলেরই একটা ট্রাঙ্ক থাকে, এবং তাহাতেই তাহার সর্ব্বস্ব রক্ষিত হয় তেমনি কর্ত্তামহাশয়েরও নিজস্ব একটা ট্রাঙ্ক ছিল। তাহাতে থান কয়েক ধুতি, কয়েকটা হাতকাটা মির্জ্জাই থাকিত; ইহাই ছিল তাঁহার সর্ব্বস্ব। শীতের সময় ভিন্ন কখনও তাঁহাকে পুরাহাতের জামা বা কোট গায় দিতে দেখি নাই। তুলাব হাতকাটা জামাই সাধারণতঃ শীতে-গ্রীষ্মে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। তিনি মনে করিতেন এই গরমের দেশে অসুখ বিসুখের সময় ভিন্ন মোজাটা নিতান্ত অনাবশ্যক বাবুগিরি।

আসবাবপত্র

নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিষ খরিদ করাকে তিনি অপব্যয় মনে করিতেন। কুমিল্লায় এত বড বাড়ী, বিটঘর বাড়ী, অথবা কলিকাতার বাড়ী সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি একটা রাইটিং টেবিল, খানকয়েক চেয়ার এই মাত্রই তাঁহার বৈঠকখানার আসবাবপত্র। দিদির অসুখের পর একবার একখানা ইজিচেয়ার বাড়ীতে আসে। আমি কিন্তু কর্ত্তা-মহাশয়কে ঐ ইজিচেয়ারে বসিতে কখনও দেখি নাই। যিনি দিনের মধ্যে আঠার ঘণ্টাই কাজে ব্যস্ত তাঁহার ইজিচেয়ারে বসিয়া আরাম করিবার অবসর কোথায়? সেজন্যই ইজিচেয়ার তাঁহার নিতান্ত অনাবশ্যক। বড় লোকের বাড়ীতে কতরকম সোফা, কোচ, কুশন-চেয়ার, ইজিচেয়ার থাকে, তাঁহার বাড়ীতে সে সব কিছুই ছিল না। তিনি বলিতেন—"জিনিষ কিনিতে হইলে অনেক কিছু আগে ভাবিতে হয়। প্রথমে জিনিষটা রাখিব কোথায়, তারপর জিনিষটার তত্ত্বাবধান করিবে কে? তারপর ভাবিতে হয় প্রয়োজন আছে কিনা, ব্যবহার

করিবার লোক আছে কিনা ইত্যাদি। আমার নিজের কোন আসবাবপত্রের দরকার হয় না, যত্ন করিবারও লোক নাই, তাই আমি সহজে কোন জিনিষপত্র কিনি না"।

যে জিনিষ কাজের অনুপযুক্ত অথবা অতিরিক্ত বোধ হইত তাহা দূরে সরাইয়া দিতে একান্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন। কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এলোপ্যাথিক ষ্টোরে একটা খুব প্রকাণ্ড ঘর-জোড়া শো-কেস্ (Show case) ছিল। কর্ত্তামহাশয়ের মনে হইল উহা কাজের অনুপযুক্ত। সকাল ৭॥ টার সময় কর্ত্তামহাশয় ভিতর হইতে আসিয়া বলিলেন—"শরৎ বাবু, এই শো-কেস্‌টা এখান হইতে সরাইয়া এখানে ছোট দুইটা শো-কেস্ করিতে হইবে। শরৎ বাবু কর্ত্তার কথা শুনিয়া লইয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজে মন দিলেন। আবার আধ ঘণ্টা পর আসিয়া কর্ত্তামহাশয় তখনই পুরাতন আসবাব বিক্রেতা কিঙ্কর পাল মহাশয়ের নিকট লোক পাঠাইতে আদেশ দিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন—"আজই যাহাতে ইহাকে এখান হইতে সরান হয়, তাহার ব্যবস্থা করাইয়া দিন।" কিঙ্কর বাবু ঘণ্টা দুই পর একজন লোক লইয়া আসিয়া তিনশত টাকা দামের শো-কেস্‌টা মাত্র চল্লিশ টাকা মূল্যে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তারপর আর দুইটি ছোট শো-কেস্ বাজার হইতে আনিয়া সেইদিনই সেখানে বসাইয়া দেন। আমরা ত কাণ্ড দেখিয়া অবাক্!

অনাবশ্যক জিনিষ অপসারিত করিতে ব্যস্ততা

কোন কাজ করা দরকার ইহা মনে স্থির সিদ্ধান্ত হইলে তখন প্রাণের তাগিদে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন। কাজটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাও দূর হইয়া যাইত।

এখন দরকার নাই হয়ত পরে দরকার হইতে পারে, এমন অবস্থায়ও তিনি জিনিষ কিনিয়া টাকা আটকাইয়া রাখা উচিত মনে করিতেন না। দরকার হইলে পাঁচগুণ দাম দিয়াও কিনিবার টাকা পাওয়া যাইবে ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। কুমিল্লা বাড়ীর জায়গা জমি খরিদ করা সম্বন্ধে ৺বরদাসুন্দর পাল মহাশয় তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মোট কথা বরদা বাবুর সহায়তা না পাইলে কুমিল্লার বাড়ী, স্কুল, দোকান, ইত্যাদি হইত কিনা সন্দেহ। বরদা বাবু ছিলেন কুমিল্লা নবাব ষ্টেটের ম্যানেজার, জমি-জমা সম্বন্ধে বুঝিতেন ভাল, হাতও ছিল যথেষ্ট। কর্ত্তামহাশয়ের কুমিল্লা-বাড়ীর বিরাট স্থান এবং তাহার পশ্চিমের দিকের জমিগুলি—যেখানে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা বাড়ী করিয়াছেন—বরদা বাবু অতি অল্প মূল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। তখন শহর এদিকে ছিল না, জমির দামও কম ছিল। কর্ত্তামহাশয়ের মনে হইল এত জমিতে তাঁহার দরকার নাই অতএব অনেক জমি তাঁহার ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। এই ভাবিয়া তিনি বিজ্ঞাপন দিয়া দুইশত টাকা দরে জমিগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। আজকাল ঐ জমির দর ৪।৫ হাজার টাকা হইবে। আমরা যখন এই কথা ভাবি তখন অস্থির হইয়া যাই, কত আপশোষ করি তিনি খামখেয়ালী করিয়া কি লোকসানই না করিলেন। কিন্তু কখনও কোন দিন কর্ত্তামহাশয়ের মুখে ঐ জমি যে তাঁহার ছিল এমন কথাও শুনি নাই। আবার প্রয়োজনাভাবে নিবেদিতা বাড়ীর সংলগ্ন যাচিয়া দেওয়া জমি পূর্ব্বে সস্তায় না কিনিয়া পরে আবশ্যক বোধে উহাই দেড়গুণ দাম দিয়া কিনিয়াও সন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি।

প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী

তাঁহার মনের কথা ছিল—"কাজের জন্য জিনিষ, জিনিষের জন্য কাজ নয়।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহার বসিবার ঘরে গুটিকয়েক চেয়ার এবং একটি রাইটিং টেবিল ছিল। ইহা ছাড়া একটা আয়নাও অনেক সময় তাঁহার ঘরে দেখিয়াছি। মানুষ ঘরে আয়না রাখে কেশ বিন্যাস করিতে অথবা পোষাক পরিচ্ছদ গোছগাছ আছে কি না দেখিতে।

আয়না ব্যবহারের উদ্দেশ্য

কিন্তু কর্ত্তামহাশয়ের আয়না রাখার উদ্দেশ্য ছিল অতি অসাধারণ স্বতন্ত্র রকমের। তিনি একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেন, "শ্রীশ, জান আমি ঘরে আয়না রাখি কেন? আয়নাটা ঘরে এমন জায়গায় রাখি যেন মুখ তুলিলেই কে ঘরে ঢুকিতেছে দেখা যায়, যে ঘরে ঢুকে তাহার চেহারাটা যেন আগেই চোখে পড়ে। আর একটা কারণ আছে—আমি ক্ষণক্রোধী, হঠাৎ রাগিয়া উঠি—রাগের সময় আয়নার দিকে তাকাইয়া নিজের চেহারা দেখিলে রাগ কমিয়া যায়। এই দুই উদ্দেশ্যে আমি ঘরে আয়না রাখি।" নিজের দোষকে সর্ব্বদা চোখের সামনে রাখিয়া আত্মশুদ্ধি করিবার এমন ঐকান্তিক চেষ্টার কথা কমই জানি। আত্মজয়ের কি তীব্র সাধনা!

আড়ম্বরের বালাই না রাখিয়াও কোনও কিছুতে কিরূপে সৌন্দর্য্য এবং বিরাটত্ব আরোপ করা যাইতে পারে, তাহা কর্ত্তামহাশয় তাঁহার বিটঘর বাড়ীতে দেখাইয়াছেন। বিটঘর বাড়ীতে দালান কোঠা নাই, যথেষ্ট পরিমাণ ঘর-দুয়ারও নাই, পাকা ঘাট নাই—কিন্তু দক্ষিণে এবং পশ্চিমে পাঁচ-সাত মাইল ব্যাপী খোলা মাঠ, খোলা পুকুরের প্রশস্ত পাড় ইত্যাদি লইয়া যে এক বিরাট সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা

যিনি দেখিয়াছেন তিনিই জানেন। ভিন্ন স্থান হইতে গ্রামে আগত ছোটবড় সকল শ্রেণীর লোক এবং জিলা বা সাব্‌ডিভিসন হইতে আগত জজ্‌, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারিগণ এই বাড়ীর অবস্থান এবং আড়ম্বরহীন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কোন বিষয়েই আড়ম্বর করাটাকে কর্ত্তামহাশয় সামান্য মাত্রও পছন্দ করিতেন না। অন্তরে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। অন্তর-প্রতিষ্ঠিত সত্য যথাযোগ্য ভাবে সর্ব্বত্র স্বয়ং প্রকাশমান—বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা ইহার প্রকাশ চেষ্টাকে তিনি মিথ্যা ও অন্যায় বলিয়াই মনে করিতেন।

আড়ম্বরহীন সৌন্দর্য্য

বড়লোকের মৃত্যুর পর ঘটা করিয়া শোক-সভা বা মিছিল করা দেশের একটা প্রচলিত প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। এইসব ব্যাপারে অনেক সময়ই দেখা যায় সমারোহের তুলনায় অন্তরের অনুভূতি অতি সামান্যই থাকে। কর্ত্তামহাশয় মৃত্যুর প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর পাঠশালার হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত জানকী বাবুর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার সত্যানুরক্তি এবং আড়ম্বরহীনতা পরিষ্কার বুঝিতে পারি। চিঠিখানার অবিকল নকল পর পৃষ্ঠায় দিলাম :—

শোক-সভা

কাশীধাম

৯-৫-৪৮ বাং।

প্রিয় জানকী বাবু,

আমার কোন প্রতিষ্ঠানে বা আমার কোন বাড়ীতে বা প্রতিষ্ঠানের বা বাড়ীর কোন লোকদ্বারা অন্যত্র কোথাও আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য যেন কোন শোক-সভা করা না হয়। তবে যাঁহারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা যেন নিজ নিজ ঘরে বসিয়া আমার আত্মার সদ্‌গতির জন্য নীরবে প্রার্থনা করেন, এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

এই বিষয়ে আপনাদিগকে আমি এখন হইতেই জানাইয়া রাখিলাম। আপনিও আপনাদের সকলকেই ইহা জানাইয়া রাখিবেন।*

আঃ

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা

পুকুর রিজার্ভ করিয়া রাখিলে জল ভাল থাকে ইহা সকলেই জানে। কিন্তু গ্রামে পুকুর রিজার্ভ করিয়া রাখা অসম্ভব, আমাদের সকলেরই এইরূপ ধারণা। কর্ত্তামহাশয়ের বাড়ীর পুকুর আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ রিজার্ভ চলিতেছে। প্রথম প্রথম ইহাকে রিজার্ভ রাখিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন গ্রামের অতি সাধারণ লোক এমন কি অশিক্ষিত বৌ-ঝিরাও রিজার্ভ রাখার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে। এই

গ্রামে রিজার্ভ পুকুর

* প্রকাশ থাকে যে কর্ত্তামহাশয় ১৩৫০ বাং সনের ২৭শে মাঘ দেহত্যাগ করেন।

রিজার্ভ পুকুর পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত আছে একজন অশিক্ষিতা কৈবর্ত্ত স্ত্রীলোক। সে তাহার কাজ যেরূপ নিপুণভাবে এত দীর্ঘকাল যাবৎ চালাইয়া আসিতেছে, তাহাতে কর্ত্তামহাশয়ের অভিনব লোক-শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্যই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

কর্ত্তামহাশয় সকল কাজই এমন একটা বিশুদ্ধ উদার জাতীয় মনোভাব নিয়া করিতেন যে, তাঁহার বাড়ীঘর ইত্যাদি সব কিছুই যেন তাঁহার নিজের নয়—সবই যেন সর্ব্বসাধারণের। তাঁহার কুমিল্লা বাড়ীর নাম "মহেশ-প্রাঙ্গণ"। এই মহেশ-প্রাঙ্গণে সহরের স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-প্রৌঢ় যে কেহই যাক্ না কেন বাড়ীর সংস্থান এবং নানা দিকের নানা প্রকার বন্দোবস্ত দেখিয়া বাড়ীটা যে একটা কোন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ী (Private House), তাহা একটুও মনে করে না। শিশু এবং স্ত্রীলোকেরা দলে দলে মহেশ-প্রাঙ্গণে বেড়াইতে আসিয়া ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়, মনে করে মহেশ-প্রাঙ্গণ যেন তাহাদেরই খেলাধূলা করিবার জায়গা।

মহেশ-প্রাঙ্গণ

মেয়েদিগকে সেখানে যাইয়া যেমন মুক্তভাবে চলাফিরা করিতে দেখা গিয়াছে তেমনটি তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতেও দেখি নাই। সেখানে শিশু এবং মেয়েদের এমন স্বাধীনভাবে চলাফিরা করিয়া পরিপূর্ণ আনন্দ এবং মুক্তির স্বাদ উপভোগ করিতে দেখিয়া কর্ত্তামহাশয় মনে মনে খুবই তৃপ্তি অনুভব করিতেন। আমাদিগকে কতদিন বলিয়াছেন—"সবই সার্থক হইল"। কর্ত্তামহাশয়ের বিটঘর বাড়ীতেও কি জানি এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে, পূজা ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সেখানে স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বেড়াইয়া মায়ের পূজাকে সার্থক করিয়া তোলে।

এ যেন তাহাদেরই পূজা, যেন তাহাদেরই বাড়ী—এমনটি আর কোথাও দেখি নাই।

মহেশ-প্রাঙ্গণের সুদীর্ঘ ইতিহাস সমগ্র বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের সহিত জড়িত—ইহা এমন দু'চার কথায় শেষ হইবার নয়। ১৯০৬ ইং সনের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, বিগত চল্লিশ বৎসর মধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত প্রবাহিত হইয়া বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সমূহ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার একটা প্রধান কেন্দ্র এই মহেশ-প্রাঙ্গণ। এই পবিত্র মহেশ-প্রাঙ্গণ সংশ্লিষ্ট হইয়া আছি বলিয়াই আমার মত ক্ষুদ্র জনের ভাগ্যেও মহামতি এ রসুল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূপেন বসু, বিপিন পাল, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, কস্তুরাবাই গান্ধী, মঃ সেরওয়ানী, মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, রাজাগোপাল আচারিয়া, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি মহামহা মনীষিগণের;—দীনেশচন্দ্র সেন, সরলা দেবী চৌধুরাণী, নরেন্দ্র দেব, নলিনী ভট্টশালী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের;—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, প্রভৃতি অভিজাত বর্গের;—সরোজিনী নাইডু, হেমপ্রভা মজুমদার, প্রভৃতি দেশবিখ্যাত বাগ্মীগণের;—সি. আর. নাইডু, মহেন্দ্রনাথ দাস, ভীমভবানী, রামমূর্ত্তি, প্রভৃতি ব্যায়ামবীরগণের;—কুলদারঞ্জন মল্লিক, প্রাণগোপাল গোস্বামী, রামদাস বাবাজী, প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের;—সন্তদাস বাবাজী, ভোলানন্দ গিরি, আলেক বাবা,

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু মহারাজগণ, মা আনন্দময়ী, স্বামী প্রণবানন্দ, প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিয়াছি। মহেশ-প্রাঙ্গণের বিগত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিলে একটা বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে। স্বদেশী যুগের যত সভাসমিতি, একজিবিসন; নন্-কো-অপারেশন (অসহযোগ) আন্দোলন যুগের বক্তৃতাদি ; কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ আইনজীবী সম্মেলন, অল বেঙ্গল প্রসেস সার্ভার্স কনফারেন্স, অল বেঙ্গল পোষ্টাল কনফারেন্স, অল বেঙ্গল টীচার্স কনফারেন্স, উলেমা কনফারেন্স, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ নিখিল বঙ্গ কনফারেন্স গুলির অধিবেশন স্থান এই মহেশ-প্রাঙ্গণ। ভাগবৎ গ্রন্থ পাঠ, ধর্ম্মবক্তৃতা, মিলাদসরিফ্ ব্যাখ্যা, ওয়াজ, মুকুন্দদাসের যাত্রাগান, রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কীর্ত্তন, ইত্যাদি কত কিছু যে সর্ব্বদা এই বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সম্যক্ আলোচনা করার স্থান ইহা নয়। বস্তুতঃ মহেশ-প্রাঙ্গণ বাংলাদেশের একটা অপ্রকাশিত তীর্থস্থান। মহেশ-প্রাঙ্গণের বিস্তৃত একখানা ইতিহাস লিখিয়া এই অপ্রকাশিত তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে সমস্ত দেশের এবং জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ঢাকা-রায়পুরার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পরক্ষণে, হাজার হাজার দুর্গত আশ্রয়প্রার্থী এই মহেশ-প্রাঙ্গণে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষের সময়ে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশনে, মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে, চিত্তরঞ্জন দাসের নন্-কো-অপারেশন প্লাবনে, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, মা আনন্দময়ীর আগমনে মহেশ-প্রাঙ্গণে যে সকল দৃশ্য এবং ভাবের বন্যা দেখিয়াছি তাহার তুলনা নাই। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—যত প্রকারের স্রোত গত চল্লিশ বৎসর মধ্যে বাংলাদেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে,

তাহার প্রত্যেকটিরই কোন না কোন ধারা এই মহেশ-প্রাঙ্গণকেও প্লাবিত করিয়াছে। সেজন্যই বলি পুণ্য স্থান মহেশ-প্রাঙ্গণের * বুকে বাংলাদেশের গত চল্লিশ বৎসরের যে ছবি অঙ্কিত আছে তাহা অতি মূল্যবান্।

যেমন বিটঘর বাড়ী, তেমনি কুমিল্লা বাড়ী কি রামমালা ছাত্রাবাস বাড়ীর পরিকল্পনা দেখিলেই আমরা কর্ত্তামহাশয়ের গভীর সৌন্দর্য্যবোধের কতকটা পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একটি রসাল উক্তি উপাদেয় হইবে ভাবিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম। একদিন কর্ত্তামহাশয় তাঁহার কুমিল্লা বাড়ীর ভিতরের একটি আমগাছ ছাঁটাইতেছেন, এমন সময় আমাকে কাছে পাইয়া বলিলেন—"শ্রীশ, মানুষের যেমন নাপিতের দরকার বাড়তি গোঁফদাড়ি কামাইয়া ছাঁটাইয়া সুন্দর রাখিতে, গাছেরও তেমনি নাপিতের দরকার।"

সৌন্দর্য্যবোধ

কর্ত্তামহাশয় মনে করিতেন তিনি সুন্দর নন্ তাঁহার শরীরে ভাল পোষাক মানায় না। সেজন্য তাঁহাকে নিজের জন্য সোয়েটার, কোট, প্রভৃতি দামী জিনিষ কিনিয়া নিজে ব্যবহার না করিয়া শ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন, "মূল্যবান জিনিষে শ্রীশকে মানায় ভাল।" কিন্তু কম দামী সাধারণ কাপড়, জামা, জুতা,

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার কিছুকাল পরে ১৯৪৬ ইং সালের অক্টোবর মাসে এই পবিত্র মহেশ-প্রাঙ্গণে নোয়াখালী হইতে আগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রপীড়িত প্রায় পাঁচ হাজার সর্ব্বহারা হিন্দু নরনারীর আশ্রয়-কেন্দ্র হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেজর এ. সি. চ্যাটার্জ্জি, আচার্য্য কৃপালনী এবং শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, প্রভৃতি দেশবিখ্যাত নেতৃবর্গের দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল।

ইত্যাদি তিনি যে রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন এবং সুরুচি সম্পন্ন ভাবে পরিধান করিতেন, তাহা অনুকরণের যোগ্য।

কর্ত্তামহাশয়ের কোন কাজে বিলাসিতা, বাবুগিরি অথবা অযথা অর্থব্যয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার কুমিল্লা বাড়ীর বড় পুকু কাঁচের দেওয়াল ওয়ালা মটর গাড়ীর ঘরখানি (Garage) দেখিয়া সর্ব্বদাই আমার মনে হইত, ইহাতে তিনি এত অনাবশ্যক খরচ করিলেন কেন? তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় কাজের সঙ্গে এই মটর গেরেজ যেন খাপ খায় না। মটর গাড়ী প্রসঙ্গে একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল। কথাটি বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী এবং ইহা কর্ত্তামহাশয়ের চরিত্রের স্নেহ-কোমল মাধুর্য্যে আলোক সম্পাত করে।

অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় একমাত্র ব্যতিক্রম

ইহা ১৯০১-২ ইং সনের কথা হইবে। তখন কলিকাতায় মটর গাড়ীর সংখ্যা অতি অল্প। কলিকাতায় উত্তরাঞ্চলে বিশেষতঃ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের রাস্তায় সারা দিনমানে আট দশ খানা মটর গাড়ী চলিত কিনা সন্দেহ। তখন পুত্র মন্মথের বয়স নয় দশ হইবে। কর্ত্তামহাশয় ২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পেছন দিকটায় থাকিতেন। মটর গাড়ীর আওয়াজ শুনিবা-মাত্রই মন্মথ ঘর হইতে ছুটিয়া রাস্তার মাঝে চলিয়া যাইত, আর বলিত, "আমি মটর গাড়ী কিনিব"। সাত আট বৎসর পর মন্মথ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, মটর গাড়ী কিনা হইল না! পরে কর্ত্তৃঠাকুরাণীর অসুখ হওয়ায় এবং স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ায় সহরের বাহিরে খোলা জায়গায় যাইবার জন্য মটর গাড়ী কিনা হয়। কর্ত্তামহাশয় সর্ব্বদাই বলিতেন, "মটর আমার নয়, মটর কর্ত্তৃঠাকুরাণীর"। বাস্তবিক পক্ষেও মটর তখন তিনি খুব কমই ব্যবহার করিতেন, কর্ত্তৃঠাকুরাণীই

ব্যবহার করিতেন বেশী। মটর কথাটার সহিত ৺মন্মথের স্মৃতি জড়িত ছিল বলিয়াই বোধ হয় তিনি, "মটর আমার নয়, মটর কর্ত্তৃঠাকুরাণীর", বলিতেন এবং মটর গেরেজের জন্য অত পয়সা খরচ করিয়াছিলেন। পুত্র মন্মথ মটরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া চলিয়া গেল, কোমল হৃদয় পুত্রবৎসল পিতা কেমন করিয়া মটর গাড়ী ব্যবহার করিবেন—এই চিন্তা তাঁহার মনে জাগরূক থাকাতেই বোধ হয় তিনি মটরের মালিকানা স্বীকার করিতে অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রামমালা ছাত্রাবাসে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বা পায় হাঁটিয়া যাইতেন, মটর বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করিতেন না।

"মটর কর্ত্তৃঠাকুরাণীর" বলার অর্থে, আমি মনে করিতাম কাহাকেও মটর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি একটা ছল উদ্ভাবন করিয়াছেন। তখন বুঝিতাম না, কত ব্যথা বেদনা অন্তঃকরণে লইয়া তিনি এই কথা বলিতেন। মানুষ না বুঝিয়া না জানিয়া এমনিভাবে যার যার নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ভাব ও ভাষায় অর্থ করিয়া মানুষের উপর অবিচার করিয়া পাপে নিমজ্জিত হয়। ক্ষমাশীল মহাপুরুষ স্বর্গ হইতে আমাকে ক্ষমা করুণ, আজ অনুতপ্ত হৃদয়ে আমি ইহা প্রার্থনা করিতেছি।

প্রতিভা বনাম শ্রমশীলতা

অসাধারণ প্রতিভা লইয়া অতি অল্প লোকই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কর্ত্তামহাশয়ের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে প্রতিভার পরিচয় আমরা কমই পাইয়া থাকি। প্রতিভার উপর তাঁহার নিজেরও যে খুব বিশ্বাস ছিল, তাহা মনে হয় না। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমশীল ছিলেন এবং পরিশ্রমকেই প্রতিভার উপর স্থান দিতেন। তাঁহার চরিত্রে এবং কথাবার্ত্তায় অনেক সময় ইহার প্রমাণ

পাইয়াছি। জীবনে উন্নতির ক্ষেত্রে একটু স্থূল বুদ্ধি কিছুমাত্র অন্তরায় নহে—অধ্যবসায় ও সাধনা সে অভাব পূরণ করিয়া অভীষ্ট বস্তু করায়ত্ত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, ইহাই ছিল তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা। এখানে এডিসনের একটা কথা মনে হইল—Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration (একভাগ উদ্দীপনা ও নিরানব্বই ভাগ শ্রমের সমবায়ই প্রতিভা)।

তিনি ছিলেন ঘষিয়া মাজিয়া নিজের পরিশ্রমে নিজের তৈরী মানুষ। একদিন তিনি হাতের লেখা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমার হাতের লেখা ও অক্ষরের ছাঁদ বড় খারাপ, ধীরে ধীরে পাতলা করিয়া লিখিতে লিখিতে এখনকার এই লেখা হইয়াছে।" বস্তুতঃ তাঁহার সকল কাজেই একটা সুসংবদ্ধ সংযম, দৃঢ়নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য দেখিতে পাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার ছিল না কিম্বা অধ্যয়ন, অধ্যাপনাতে সময় ব্যয় করিবার সুযোগ সুবিধাও তাঁহার হয় নাই। কার্য্যব্যপদেশে চিঠিপত্র লিখা এবং সেই সূত্রেই হোমিওপ্যাথিক পুস্তক প্রকাশ কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া ছাড়া, বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনা তিনি করেন নাই। কিন্তু কর্ম্মে নিষ্ঠা, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমশীলতা গুণে বাঙ্গালা ভাষায় যে বুৎপত্তি ও আশ্চর্য্য প্রকাশ ক্ষমতা তাঁহার হইয়াছিল, তাহা তাঁহার "ব্যবসায়ী" এবং "আত্মচরিত" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। "আত্মচরিত" পুস্তকের ভাষায় যে সরল সোজা প্রকাশভঙ্গী দেখিতে পাই তাহা অতি উচ্চ স্তরের। এই ভাষাও পরিশ্রম করিয়া মাজা ঘষার ফল। তাঁহার লেখাতে বর্ণাশুদ্ধি কখনও দেখি নাই। লেখায় বর্ণাশুদ্ধি দ্বারা শিক্ষা ও সভ্যতার নিম্নস্তর বুঝায়, কারণ ইহা অসাবধানতার ফল—কর্ত্তামহাশয়ের এইরূপ অভিমত ছিল।

তাঁহার চিন্তাপ্রণালী এবং প্রকাশ-ভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সরল এবং সহজ। কার্লাইলের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—In all his thinking and speaking he was wonderfully clear. (তিনি ভাবে ও ভাষায় বিস্ময়কর ভাবে সুস্পষ্ট ছিলেন)। বস্তুতঃ তাঁহার অন্তরে কোন ঘোর-প্যাচ ছিল না। সেজন্য অপ্রিয় সত্য কথাকে তিনি ছাপিয়া রাখিতে পারিতেন না, অথবা মিথ্যাতে লালিত্য যোগ করিয়া তিক্ততা কমাইতেও জানিতেন না। সেই হেতু "ক্ষণ-ক্রোধী", "তিক্ত ভাষী" ইত্যাদি অপবাদও তাঁহার ছিল। কার্লাইলের Hero (বীর)র inward man and outward man is one (অভিন্ন অন্তর্ব্বাহ্য) হইতে পারে; কিন্তু এই সংসারে ভিতর বাহির এক হইলে অনেক সময় অনেক গোলমালও বাঁধে। কর্ত্তামহাশয়ের পারিবারিক জীবনেও এই কারণে অনেক ঝঞ্ঝাট অনেক সময় উপস্থিত হইয়া অনেক অশান্তি ঘটাইয়াছে। ভাইপোর এক মেয়ে সকল রকমে গুণবতী সুন্দরী কিন্তু একটা চোখ একটু ট্যারা, এমন দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়; তবুও কর্ত্তামহাশয় আদেশ করিলেন চোখের এই দোষ গোপন করিয়া বিবাহ চলিবে না। কেহ মেয়ে দেখিতে আসিলেই বলা হইত "চোখে দোষ আছে।" এমন করিয়া অনেক বেগ পাইয়া শেষে মেয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর কিন্তু বরপক্ষ হইতে মেয়ের চক্ষের সম্বন্ধে কোন অভিযোগ হইয়াছে একথা আমরা জানি না। সত্যগোপন করিয়া কোন কাজ হইতে পারিবে না, এই ছিল তাঁহার নীতি। তাঁহার সত্যপ্রকাশ দ্বারা পরিবারের আর পাঁচ জনের যে কত অশান্তি হইতে পারে তাহা তাঁহার ভাবিবারও অবসর ছিল না।

ভাব ও ভাষায় ঐক্য

সত্যগোপনে অনিচ্ছা

কর্ত্তামহাশয় হঠাৎ বড় হন নাই, তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলিও হঠাৎ এত বড় হয় নাই। তিনি চরিত্র বলে তিল তিল করিয়া জমাইয়া তাল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতে একটু একটু করিয়া বাড়াইয়া বড় করিয়াছেন। ক্ষুদ্র আরম্ভ, ক্ষুদ্র আয়, ক্ষুদ্র ব্যয়, ক্ষুদ্র লাভকে ক্ষুদ্র অথচ নিয়মিত সঞ্চয় দ্বারা বড় করিয়াছেন। তাঁহার জীবন অধ্যবসায়, ধৈর্য্য এবং সংযমের ইতিহাস।

ক্রমোন্নতি ও মিতব্যয়িতা

একদিকে যেমন ছিল তাঁহার পরিশ্রমশীলতা আর একদিকে ছিল তেমনি মিতব্যয়িতা—তাঁহার চরিত্রের এই দুইটা প্রধান দিক্। মিতব্যয়িতা বলিতে আমরা সাধারণতঃ টাকা পয়সা কম খরচ করাই বুঝি। কিন্তু তাঁহার মিতব্যয়িতার অর্থ শুধু টাকা পয়সা কম খরচ করার চেষ্টাই ছিল না। যেখানে যাহা খরচ করা অবশ্য দরকার তাহাতে তাঁহাকে কদাচ ব্যয়কুণ্ঠ হইতে দেখি নাই। তাঁহার মিতব্যয়িতায় দোকানদারী ছিল যথেষ্ট। অল্প খরচ করিয়া বেশী উপকার করা এবং অনাবশ্যক অকেজো অংশ বর্জ্জন করাই ছিল তাঁহার মিতব্যয়িতার লক্ষণ। খাঁটি ব্যবসাদার পুঁজি হিসাব করিতে এবং ভাল গৃহস্থ গরু, বীজ ও চাষের বেলায় যেমন মুক্তহস্ত হয় তিনিও তেমনি আরব্ধ কার্য্যকে সুন্দর এবং সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাথমিক খরচে একটুও কৃপণতা করিতেন না। ঈশ্বর পাঠশালা এবং রামমালা ছাত্রাবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দালান কোঠা, আসবাব-পত্র দেখিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সবই মজবুত, ভাল ভাল উপকরণের এবং স্থায়ী ও টেক্‌সই সব কাজ। কর্ত্তামহাশয় যে সকল বিষয়েই মিতব্যয়ী, কঠোর নিয়মতান্ত্রিক এবং অপব্যয় বিরোধী ছিলেন তাহার উদাহরণ

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে অপর একটি ঘটনা উল্লেখ করিব। যদিও ঘটনাটি অতি সামান্য তথাপি তাহা দ্বারা কর্ত্তামহাশয়ের চরিত্রের আরও দু-একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট প্রকটিত হইয়া উঠিবে।

তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর মধ্যে অবসর বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। নানা কাজের ফাঁকে যখনই একটু সময় করিতে পারিতেন তখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, ঘরবাড়ীর এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং রাস্তা, ড্রেইন, বেড়া ইত্যাদি কোথায় কি জীর্ণ অথবা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন আছে অথবা কোন কিছু নষ্ট হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন। একদিন তেমনি এক কাজের ফাঁকে রান্নাঘরের কাছে যাইয়া তিনি দেখিলেন বাহিরে জমান আবর্জ্জনার মধ্যে একটা বেগুন পড়িয়া রহিয়াছে। কর্ত্তামহাশয় বেগুনটা কুড়াইয়া লইয়া পাচক ঠাকুরকে ডাকিয়া বেগুনটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"এ বেগুনটা পুড়িয়া আমাকে দিও।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। তারপর খাইতে বসিয়া পাচক ঠাকুর হইতে চাহিয়া লইয়া ঐ বেগুন পোড়া খাইয়াছেন দেখিয়াছি। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখানু সবারে"—নীতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এখানে দেখিতে পাই। এই বেগুণ সম্বন্ধে কাহাকেও আর কিছু বলিতে শুনি নাই। সকল অন্যায়ের শাস্তি তিনি একাই বহন করিবেন ইহাই যেন ছিল তাঁহার মনোগত ভাব।

চরিত্র বৈশিষ্ট্য

তিনি নিজে যেমন মিতব্যয়ী ছিলেন তেমনি সকলকে পরামর্শও দিতেন মিতব্যয়ী হইতে। তাঁহার মিতব্যয়িতা শুধু অর্থের মিতব্যয়িতা ছিল না। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "মিতব্যয়িতা বলিতে, মানুষ

কেবল টাকাকড়ির মিতব্যয়িতা বুঝে। কিন্তু তা নয়, টাকা-পয়সা, সময়, স্থান, পরিশ্রম, কথা, প্রভৃতি মানুষের সকল ব্যাপারেই মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি থাকা দরকার।"

বস্তুতঃ তাঁহার যেমনি মিতব্যয়িতা ছিল টাকা-পয়সা ব্যয়ে, তেমনি ছিল সময়, কাজ, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা, চিঠিপত্র লেখা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে। দশহাত ধুতির পরিবর্ত্তে আট হাত ধুতি ব্যবহার করা; সাধারণ লোক, যাহাদিগকে খাটিয়া খাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে লম্বা পুরা হাতের জামা না পরিয়া হাতকাটা খাট জামা পরার উপদেশ; খাবার সময় পাতে নুণ না দিয়া নুণের বাটী এবং ছোট কাঠের চামচ ব্যবহাব কবা, এমন সব ছোট ছোট প্রতি ব্যাপারে তাঁহার মিতব্যয়িতা লক্ষ্য কবিয়াছি। এক টুকরা কাগজ, একটা আল্‌পিন অথবা একটা কর্ক অপব্যয়ে অত্যন্ত অস্থির হইতে যে মানুষকে দেখিয়াছি, আবাব সেই মানুষকেই হাজার হাজার টাকা অকুণ্ঠিত চিত্তে দান করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কাজের চিঠি পত্র অথবা কথাবার্ত্তায় এমন সংক্ষিপ্ত, বাহুল্য বর্জ্জিত এবং অর্থপূর্ণ (straight to the point) বাক্য ব্যবহার আব কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কথারও দর আছে—মিতভাষী হইয়া অল্প, সংক্ষেপ অর্থপূর্ণ কথা বলিয়া এবং কথার সহিত কাজের সঙ্গতি রাখিয়া কথার 'দর' বাড়াইতে হয়, ইহা তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছি।

কঠোর জীবন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কর্ত্তামহাশয়ের জীবন পবিচালিত হইয়াছিল। তাহাতেই সম্ভবতঃ তাঁহার চালচলন ও কথাবার্ত্তার ছন্দে একটা শক্ত কঠিন ভাব ছিল। সাধারণ অনেকের কাছে তাঁহাকে কিছুটা দুর্দ্ধর্ষ বলিয়াই মনে হইত। বাস্তবিক পক্ষেও

তাঁহার চেহারায় তেমন কমনীয়তা ছিল না। ভাষার মধ্যেও সত্যহীন কোমলতা ছিল না। কঠোর সত্যই ছিল তাঁহার সাধনার বিষয়। এই হিসাবে সত্যের কঠোরতা ছিল তাঁহার ভিতর এবং বাহিরের রূপ। কিন্তু এই মহাত্মার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং আত্মীয়তা ঘটিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই জানেন নারিকেল ফলের মত শক্ত আবরণের মধ্যে সুমিষ্ট জল এবং শস্য পরিপূর্ণ এই মানুষটির অন্তর কত কোমল এবং কত মধুর ছিল। পরদুঃখকাতর, দেশব্রতী, বালবিধবার দুঃখে দুঃখী, দানশীল, সদা কর্ম্মে রত এই মহাত্মার বন্ধুজনপ্রীতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমত্ব যে কি পরিমাণ ছিল, তাহার উদাহরণ আমার অনেক জানা আছে। দেশ এবং সমাজের বড় বড় সমস্যাগুলিতে ব্যাপৃত তাঁহাব বহুশাখ-কার্য্যসূচী তাঁহাকে সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার সমূহ হইতে সময় সময় দূরে রাখিত বলিয়া, সামাজিক লৌকিকতা এবং আত্মীযতা জনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অনুষ্ঠানের বিষয় তাঁহার মনে আসিত না, ফলে এইসব বিষয়ে সময় সময় ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিত। কিন্তু যদি কেহ এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখ করিয়া তাঁহাব কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেন তবে তিনি বড়ই সুখী হইতেন। যাত্রাগান উপলক্ষ্যে তিনি নিকটবর্ত্তী আত্মীয়দের বাড়ীতে টিকেট ও গাড়ী ভাড়ার জন্য টাকা পাঠাইতেন। ইহা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। একবার কোন নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ের বাড়ীতে টাকা পাঠান হয় নাই, ইহা আমি স্মরণ করাইয়া দিলে, কর্ত্তামহাশয় অত্যন্ত খুসী হইয়া বলেন—"তুমি মনে করিয়া খুব ভাল করিয়াছ। আমার অনেক সময় এমন সব সামাজিকতার কথা মনে থাকে না; সেজন্য আত্মীয়-স্বজনগণ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়—কেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে তাহা

আমি বুঝিতেও পারি না।" প্রকৃত প্রস্তাবেও তিনি অর্থহীন মিথ্যা সামাজিকতার কথা ভাল বুঝিতেন না। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, সত্যকার কাজ উপস্থিত হইলে তিনি প্রকৃত সামাজিকতা খুব ভাল করিয়াই করিতে পারিতেন। আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত অথবা প্রতিবেশী কাহারও ব্যারাম পীড়ায় তিনি যে কি পরিমাণ ব্যাকুল হইতেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার অনেক লোক এখনও জীবিত আছে। অনেকের নিকট হইতেই অনেক সময় তাঁহার হৃদয়ের এই দিকটার সন্ধান পাইয়াছি। পাড়াপ্রতিবেশী কেহ রোগে পড়িলে তিনি আবশ্যকমত সেবা, শুশ্রূষা, পথ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত ত করিতেনই, নিজেও বার বার গিয়া রোগীর তথ্য লইতেন। প্রতিবেশী কাহারও কোন অসুখ বিসুখ হইলে তিনি দূর দেশে থাকিলেও রোগী এবং চিকিৎসা বিধান ও শুশ্রূষা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সকল বিষয় নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে দৈনিক চিঠি লিখিয়া জানাইবার উপদেশ আমাদের প্রতি ছিল। প্রতিবেশী কাহারও রোগ-শোক ইত্যাদির কথা তাঁহাকে যথাসময়ে না জানাইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। এমন সব ব্যাপারে "আমি কি করিতে পারি", এমন একটা প্রশ্ন যেন তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকিত। কুমিল্লায় বরফ সহজলভ্য ছিল না, ঔষধ পথ্যাদিও সময় সময় কলিকাতা হইতে আনা আবশ্যক হইত। এই সকল আমাদিগকে অনেক সময় তাঁহার উপদেশ এবং অভিপ্রায় মত যোগাড় করিয়া দিতে হইয়াছে। যেখানে শুশ্রূষাকারী লোকের দরকার সেখানে আমাদিগকে দল বাঁধিয়া পালা করিয়া সেবা শুশ্রূষাও চালাইতে হইয়াছে। তিনি নিজেও সর্ব্বদা যাইয়া রোগী এবং শুশ্রূষাকারীদের খবর লইয়াছেন। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন

সামাজিকতা

সত্য, কিন্তু কৃপণ ছিলেন এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, দরকার মত খরচ করিবার জন্য সংসারী লোকের টাকা সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু টাকার প্রতি 'মায়া' হওয়া অন্যায়। নিজের জিনিষের জন্য খুবই মায়া আছে অথচ পরের জিনিষের জন্য সামান্য মাত্র দরদও নাই এমনটাই সচরাচর আমাদের চক্ষে পড়ে।

মিতব্যয়ী অথচ অকৃপণ

কর্ত্তামহাশয়ের কিন্তু জিনিষ মাত্রেই একটা দরদ ছিল যেন লোকসান বা অপব্যয় না হয়, তা সে জিনিষটা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। টাকা-পয়সার বেলায়ও দেখিয়াছি, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বা কর্ম্মচারী কাহারও হাতে দু-পয়সা হইয়াছে শুনিলে তিনি বড়ই খুসী হইতেন এবং তাহাকে উৎসাহ দিতেন। নিজের টাকায় নিজের কোন কাজ করিতে হইলে আমরা যেমন তেমন করিয়া কম খরচে কাজটা সারিয়া লইতে চেষ্টা করি, কিন্তু অন্যের টাকায় করিতে হইলে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করি না—এমন অনেক সময় হইয়া থাকে। কিন্তু এই সব ব্যাপারে কর্ত্তামহাশয় ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। নিবেদিতা অথবা রামমালায় ছেলেমেয়েদিগকে জিনিষ পত্রের যত্ন করিতে দেখিলে তিনি খুব খুসী হইতেন এবং তাহাদিগকে খুবই উৎসাহ দিতেন। শেষ বয়সে দেখিয়াছি তাঁহার নাত্নীরা মুড়ি খাইতে গিয়া মুড়ি মাটিতে ফেলিতেছে ছড়াইতেছে, আর তিনি পাশে বসিয়া একটি একটি করিয়া মুড়ি ডালায় তুলিয়া দিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে তিনি যেন তাঁহার মিতব্যয়িতা ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। মিতব্যয়িতাই যে তাহার জীবনের একটা সাধন-পন্থা ছিল, তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক দোকানের নাম Economic Pharmacy (ইকনমিক

ফার্ম্মেসী) হইতে বেশ বুঝিতে পারি। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় যে এক ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা এবং গঠন কার্য্য পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছিল তাহার নামও রাখা হয় Economic Bank (ইকনমিক ব্যাঙ্ক)। তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী, অপচয় করাকে তিনি মহাপাপ বলিয়াই মনে করিতেন। রামমালা ছাত্রাবাস এবং নিবেদিতা ছাত্রীনিবাসের ছেলেমেয়েরা যাহাতে মিতব্যয়ী হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাহাদের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতেন। এই সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিব। একদিন তিনি 'নিবেদিতা বোর্ডিং'এ কি একটা কাজ দেখিতে চলিয়াছেন, বোর্ডিং বাড়ী হইতে রান্না ঘরে যাইবার রাস্তায় এক টুকরা কয়লা পাইয়া তাহা কুড়াইয়া হাতে লইলেন। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটি মেয়ে তাঁহাকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। মেয়েটিকে ডাকিয়া কয়লার টুকরাটা হাতে দিয়া বলিলেন—"দেখ মা, এই কয়লার টুকরাটা রাস্তায় পড়িয়াছিল, ইহা কয়লার চৌবাচ্চায় রাখিয়া দাও। মা, আমার টাকা বড় কষ্টের টাকা, শরীরের রক্ত জল করিয়া টাকা রোজগার করিয়াছি। এই টাকার অপব্যয় হইলে বড় কষ্ট পাই। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও একটুও যেন অপব্যয় না হয়, অবশ্য কাজের প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহারে বাধা নাই। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও—খুব খাবে দাবে, এ বিষয়ে কৃপণতা অকর্ত্তব্য কিন্তু বিলাসিতা বর্জ্জনীয়; আবার অযত্নবশে লোকসান বা অপচয় না হয় তাহাও দেখিও।" এই বলিয়া অদূরে যেখানে রাজ যোগালীরা কাজ করিতেছিল সেখানে চলিয়া গেলেন। বর্ত্তমানে দেশের উপর দিয়া এক ভীষণ দুর্দ্দশার হাওয়া বহিতেছে—চারিদিকে অপচয়, লোকসান ও ক্ষতি চলিয়াছে। ছেলে

বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সকলেই যেন আত্মপর নির্ব্বিশেষে অর্থ-বিত্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি সব কিছুরই লোকসান করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। এই নৈতিক অধঃপাতের দিনে চরিত্রবলে বলীয়ান, দৃঢ়চিত্ত এই মহাপুরুষের জীবনস্মৃতির এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী পড়িয়া বা শুনিয়া যদি দু-একটি ছেলে বা মেয়েও চরিত্র গঠনে দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সাধনশীল হয়, তবেই কর্ত্তামহাশয়ের প্রতি বাস্তব শ্রদ্ধা দেখান হইবে। ভাবের বিলাসে তিনি কাজ করিতেন না। কাজের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতেই তাহার নিকট ভাব (imagination) আসিয়া পৌছিয়াছিল। কর্ম্ম-বেদই ছিল তাঁহার প্রধান শাস্ত্র-গ্রন্থ। "নষ্ট করিলে কষ্ট পায়"—এ কথাটা তাঁহাকে সর্ব্বদা বলিতে শুনিয়াছি।

ভাববিলাস বর্জ্জিত একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধনা

পরের সঙ্গে কাজ-কারবারে তিনি তাঁহার দাবীর মাত্রা কতটুকু কমাইতে পারিতেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হই। দরিদ্রের বাড়ীতে যাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প আয়োজন উপকরণে আহার করিয়া তাঁহাকে খুবই সন্তোষ এবং তৃপ্তিলাভ করিতে দেখিয়াছি। এমন নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাঁহাকে ঠাকুরমার নিকট বলিতে শুনিয়াছি—"মা ঠাক্‌রুণ, আজ অমুকের বাড়ীতে খুবই তৃপ্তির সহিত খাইয়া আসিলাম। অমুকের বৌ যেমন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরিপাটি করিয়া খাওয়াইল তেমন ভাবে আমরা নিজেরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনকেও খাওয়াইতে পারি না। বড়লোকের বাড়ীতে উপকরণের বাহুল্য এবং আন্তরিকতাহীন লৌকিকতায় অনেক সময়ই ঠিকমত খাওয়া হয় না।"

তাঁহার চরিত্রের আরও দু-একটি বৈশিষ্ট্য

যাতায়াত কালে তাঁহারই সুখ-সুবিধা দেখিবার জন্য আমরা তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। কিন্তু পথে যাইয়া সর্ব্বদাই দেখিয়াছি তিনিই আমাদের সুবিধা অসুবিধার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। জাহাজে বা গাড়ীতে উঠিবার সময় তিনি আমাদিগকে ছাতি, লাঠি বা লণ্ঠনটা দিয়া নিজেই বড় জিনিষটা লইতে চেষ্টা করিতেন। পথে অনবরত খোঁজ-খবর নিতেন আমরা খাইয়াছি কিনা, আরও কিছু খাইব কিনা, ইত্যাদি।

প্রথম জীবনে বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সামাজিকতা বা লৌকিকতা করিতে অবসর পান নাই। শেষ বয়সে তাঁহাকে জ্ঞাতির বিবাহে বরযাত্রী হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি।

আলো না হইলে আমাদের চলে না। কিন্তু পরিপূর্ণ আলো কি আমাদের চক্ষে সহ্য হয়? তাহা হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ত্তামহাশয়ের চিন্তাধারা এবং কার্য্যপ্রণালী ছিল অনন্যসাধারণ। কার্য্য-ব্যপদেশে অনেকের সঙ্গেই কর্ত্তামহাশয়ের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে দেখিয়াছি। আবার কার্য্য ও চিন্তার অনৈক্য হইলে সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেও দেখিয়াছি। শক্তিশালী মননশীল চিত্ত যে শক্তিবলে একবার আকর্ষণ করিয়াছিল, সম্বন্ধ টুটিয়া যাওয়ার পর সেই শক্তিবলেই আবার তাহাদিগকে নিজ হইতে সরাইয়া দিয়াছে। পুরাতন বন্ধুর প্রতি ব্যবহারে সাধারণ লোক প্রীতি ও মমতাবশে অনেক সময়েই ন্যায় ও সত্যের নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করিয়া চলে, কিন্তু সত্যসন্ধ এই মহাপুরুষের নিকট সত্য এবং ন্যায়ের তুলনায় বন্ধুর বন্ধুত্ব অতি অকিঞ্চিৎকর ছিল বলিয়াই তিনি বন্ধুত্বের দাবীকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেন। সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়া তিনি স্ত্রীর দাবী, পুত্রের স্নেহকেও তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহারও কত উদাহরণ জানি। সেজন্যই পূর্ব্বে এক

জায়গায় লিখিয়াছি তিনি পারিবারিক জীবনেও ছিলেন অনেকটা একাকী ও নিঃসঙ্গ।

সত্যের খাতিরে তিনি বন্ধুর বন্ধুত্বকে ঠেলিয়া ফেলিতে যেমন একটুও দ্বিধা বোধ করিতেন না, তেমনি আবার নব নব সত্যের অনুসন্ধানে কোন মতবাদকে চিরকাল ধরিয়া রাখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সেজন্য আমরা অনেক সময় তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া মনে করিয়াছি তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত চঞ্চল। কিন্তু তখন একটুও ভাবিতে পারি নাই যে, এই মতপরিবর্ত্তনটা পরিপূর্ণ জীবনেরই লক্ষণ। সত্যকার মননশীল যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রাণের তাগিদেই সত্যের নূতন নূতন প্রকাশের সঙ্গে চলিতে গিয়া মত বদলাইতে হয়। সেজন্যই ঋষি মেটারলিঙ্ক বলিয়াছেন—Truly wise you are not, unless your wisdom be constantly changing from your childhood on to your death (আশৈশব মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার জ্ঞান নিয়ত বিবর্ত্তিত না হইলে তুমি যথার্থ বিজ্ঞ নহ)। মানুষ দোষে গুণে মিশ্রিত। মেটারলিঙ্ক বলিয়াছেন—Flesh must yield—রক্ত মাংসের শরীরে ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি হইবেই। কর্ত্তামহাশয় এই সত্য ভাল করিয়াই জানিতেন এবং স্বীকারও করিতেন। কেহ তাঁহার ভুল ত্রুটি দেখাইয়া দিলে অত্যন্ত খুসী হইতেন। অতীত ভুল-ভ্রান্তি তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইলে তিনি তাহার প্রতীকার করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন। আর যেখানে প্রতীকার অসম্ভব সেখানে আত্মনিগ্রহ (self-imposed punishment) এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিতেন না। অর্থের বিনিময়ে যেখানে এই প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব তেমন বহু

পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষণ

ক্ষেত্রে আমি নিজের হাতেও তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের মূল্য দিয়া আসিয়াছি। অন্যায় করিয়া অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত এমন ভাবে মাথা পাতিয়া লইবার মত শক্তিশালী দৃঢ় মন আমি আর দেখি নাই। ছোট-বেলায় খেলিতে গিয়া সমবয়স্ক চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্যের একটা জামা ছিঁড়িয়া ফেলার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বহু বৎসর পর তাঁহার বিধবাকে ২৫৲ পঁচিশ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইবার কথাও আমি জানি। কবি লংফেলো সত্যই বলিয়াছেন—Man-like it is to fall into sin; Christ-like it is for sin to grieve (পাপে নিপতিত হওয়া মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, আর পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া মহামানবযোগ্য)।

পূর্ব্বে এক স্থানে লিখিয়াছি কর্ত্তামহাশয়ের সহিত ডিষ্ট্রিক্ট-ইঞ্জিনিয়ার পূর্ণবাবুর বিশেষ বান্ধবতা ছিল। ইঞ্জিনিয়ার বাবু আমাকে বলিয়াছেন, "নানা কাজ-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে মহেশবাবুর সহিত আমার মতের মিল না হওয়ায় আমি অনেক সময় অনেক কঠোর কথা তাঁহাকে বলিয়াছি। অনেক সময়ই তিনি চুপ করিয়া গিয়াছেন এবং পরে নিজের ভুল বুঝিলে তাহা স্বীকার করিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার মত লোক বলিয়াই আমিও তাঁহাকে এত কঠোর কথা বলিতে সাহস করিয়াছি। নিজের দোষ অঙ্গীকার করিয়া পরে শোধরাইবার চেষ্টা করিবার মত এমন সারল্য ও উদারতা খুব কমই দেখা যায়।" নিজের ভুল-ত্রুটী স্বীকার করিবার মত তাঁহার যে সৎসাহস ছিল, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার জীবনের ছোট বড় অনেক ব্যাপারেই লক্ষ্য করিয়াছি। ন্যায় ও সত্য চয়নে তিনি কখনও স্থান-কাল-পাত্রের বিচার করিতেন না। মনুসংহিতায় আছে—নীচাদপি উত্তমা বিদ্যা শিক্ষনীয়া প্রযত্নতঃ।

কর্ত্তামহাশয়ের বহুমুখী চিন্তাধারা এবং চরিত্রের দৃঢ়তার বিষয় আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন আসে, তিনি এই শিক্ষা, সংস্কার ও চরিত্রবল কোথা হইতে লাভ করিলেন? তাঁহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যেমন একদিকে পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত মনে করিতে পারি, তেমনি আবার ইহাও ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তাঁহার শিক্ষা, সংস্কার ও চরিত্রবল ব্যক্তিগত কঠোর সাধনার ফল। পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত এবং ব্যক্তিগত সাধনা এই দুই-এর মধ্যে তুলনা করিলে ব্যক্তিগত সাধনোচিত উৎকর্ষ তাঁহার মধ্যে বেশী দেখিতে পাই।

তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, বিদ্যাদানে উৎসাহ, সংযম, আচার, ত্যাগশীলতা প্রভৃতি কতগুলি গুণ যে তিনি তাঁহার মাতা বামমালা দেবী এবং ত্যাগশীল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার আত্মচরিত হইতে জানিতে পারি। কিন্তু নিজ-সাধন লব্ধ বিষয়ের জন্যও ত একটা আদর্শ বা উৎসের আবশ্যক হয়। কর্ত্তামহাশয়ের এই উৎস কোথায়, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিলেও কিছুটা অনুমান করিয়া আলোচনা করিলে অসঙ্গত হইবে না।

আচার নিষ্ঠা

তিনি আচার-নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই আবেষ্টনীর মধ্যে বাল্যকাল কাটাইলেও তাঁহাকে কখনও আচার-নিষ্ঠার খুঁটি নাটি লইয়া গোঁড়ামি করিতে দেখি নাই। তিনি নিজে অনাচারী ছিলেন না, অন্যে অনাচার করে তাহাও তিনি ইচ্ছা করিতেন না। বরং যথার্থ আচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবানদের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার আচার নিষ্ঠা ছিল সংস্কারমুক্ত ও সার্ব্বভৌমিক—কোন গণ্ডী বা সীমারেখা

তাহাতে ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার কোনপ্রকার সংকীর্ণতা ছিল না; অত্যন্ত উদার ভাবাপন্ন হইয়া সকল ধর্ম্মের কথাই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। রামমালা ছাত্রাবাসের ঠাকুর ঘরে শালগ্রাম চক্র, শিবলিঙ্গ এবং প্রাচীরগাত্রে মক্কার মসজিদের চিত্র সবই তিনি একত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলে আমরা অনেকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না কিছু বক্তৃতা না দিয়া সংযত থাকিতে পারি না; কিন্তু কর্ত্তামহাশয়কে কখনও কোথায়ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও বক্তৃতা দিতে বা মতামত প্রকাশ করিতে শুনি নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেহ তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে বলিতে শুনিয়াছি—"আমি দোকানদার মানুষ, এ সম্বন্ধে কি জানি"? ইত্যাদি।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণা

তাঁহার নিকট ধর্ম্ম ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই তিনি ধর্ম্ম অথবা সম্প্রদায়ের বহিরাবরণে মুগ্ধ না হইয়া যাহার ব্যক্তিত্বে যেটুকু আদর্শ বিচারপূর্ব্বক তাহাই গ্রহণ করিতেন। তিনি জানিতেন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের খোলসে আবৃত হইয়া অসৎ লোকেরা অনেক সময় নানা প্রকার অসাধু আচরণ করিয়া থাকে। সাধারণ লোক তাহার সূক্ষ্মবিচার পরিশূন্য মনোবৃত্তিতে কোন একটা কিছুকে মানিতে পারিলেই যেন জীবন ধন্য হইয়া গেল মনে করে। তাই তাহারা ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়ের খোলস দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইয়া যায়। মননশীল নয় বলিয়া তাহারা মানিয়া চলিতেই আনন্দ ও স্বস্তি পায় বেশী। কিন্তু কর্ত্তামহাশয় ছিলেন স্বাধীন মনোভাবাপন্ন শক্তিশালী লোক এবং বুদ্ধির স্বাধীন ক্ষেত্রে বিচরণ করাই ছিল তাঁহার স্বভাবশীল ধর্ম্ম। তাই তাঁহার পক্ষে নিজে বিচার না করিয়া কোন কিছু গ্রহণ করা একান্ত অসম্ভব

ছিল। যে কোন সম্প্রদায়ের তথা-কথিত অনুগামীদিগকে (camp followers) দেখিতে পাই তাহারা তাহাদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের উদ্দেশ্যের প্রতি সামান্য মাত্র লক্ষ্যও না করিয়া সাম্প্রদায়িক দাম্ভিকতায় এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না।

ধর্ম্মহীনতাই সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল

কিন্তু কর্ত্তামহাশয়কে যদিও সকল সম্প্রদায়ের সকল রকম লোকের সঙ্গেই নানা কার্য্য ব্যপদেশে সর্ব্বদা মেলা-মেশা করিতে হইত, তবুও তাঁহাকে কখনও কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা বা প্রশংসা করিতে শুনি নাই। Do not disturb the faith of any (কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিও না), এই মহাজন বাক্য তিনি সত্য করিয়াই জানিয়াছিলেন এবং গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতকার বৈষ্ণব লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।" স্ব স্ব ধর্ম্মে আস্থাবান লোকদিগকে তিনি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মুসলমান কর্ম্মচারী আইনদ্দি ওস্তাগারকে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া মক্কা পাঠাইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মই এক; স্ব স্ব ধর্ম্মে যথার্থ নিষ্ঠা থাকিলে কোনপ্রকার ধর্ম্মবিরোধ হইতে পারে না—ইহাই তিনি মনে করিতেন। ধর্ম্মহীনতার দরুণই ধর্ম্মের খোলস লইয়া মানুষ মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে, ইহাই ছিল তাঁহার স্থির বিশ্বাস। সত্যধর্ম্ম যে কোন সম্প্রদায়েরই হৌক না কেন, উহা আনিয়া দেয় মানুষের চিত্তে সম্প্রসারতা, বিশ্ব-মৈত্রী ও প্রেম। মনে হইল—স্মাইল্‌স্‌-এর অমূল্য বাণী Love is the universal solvent. (প্রেমই বিশ্ব-সমাধান)।

যাহা কিছু যেখানে ভাল, তাহাকে সম্মান করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার একটুও কুণ্ঠাবোধ ছিল না। সত্যনিষ্ঠাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র আর উহাই যোগাইত তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণা। আমার মনে হইত এই সদাকর্ম্মশীল মহাত্মার জীবনটা ছিল একটা Continued prayer (নিরবচ্ছিন্ন সাধনা);

ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ

সেজন্য তাঁহার স্বতন্ত্র মন্দির, স্বতন্ত্র বিগ্রহ, স্বতন্ত্র মন্ত্র-তন্ত্র বা স্বতন্ত্র গুরুর দরকার বেশী ছিল না। তিনি জানিতেন—"Every man can build a chapel in his breast, himself the priest, his heart the sacrifice, and the earth he treads on his altar (এই পৃথিবীকে বেদী, হৃদয়কে বলি, এবং নিজেকে হোতা পরিণত করিয়া প্রত্যেকেই আপন অন্তরে সাধন মন্দির সৃজন করিতে পারে) [Jeremy Taylor]. আজকাল অনেককে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক আবৃত্তি করিতে অথবা উপনিষদ বা অন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি আওড়াইতে দেখিতে পাই। কর্ত্তামহাশয়কে এ সকল গ্রন্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে কখনও দেখি নাই। রীতিমত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিষ্ঠার সহিত পাঠ না করিয়া শুধুমাত্র গ্রন্থ লইয়া খেলা করাকে তিনি অনধিকার চর্চ্চা বলিতেন। নিজের বেলায়ও তিনি নিজেকে অনধিকারী মনে করিতেন। সংযত, নিষ্ঠাপরায়ণ, সদাচারসম্পন্ন হইয়া এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ দেশের লোকে পাঠ করুক এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত পাঠের নিমিত্ত তিনি বড় বড় অক্ষরে গীতা, চণ্ডী, মোহমুদ্গরের মূল সংস্কৃত অংশ ছাপাইয়া বিনামূল্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য নিয়মিত পাঠকদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মগ্রন্থ বিতরণ

বস্তুতঃ তাঁহার ধর্ম্মছিল সত্য, ন্যায় এবং দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। উহা ছিল নিতান্ত বাস্তব ধর্ম্ম, একটুও পুঁথিগত নয়। কর্ত্তামহাশয়ের ধর্ম্মমতের কথায় আমার মনে হয় ঋষি টলষ্টয়ের কথা—Religion is life, a real and substantial thing, not a soaring intellectual imagination (ধর্ম্মই জীবন, পরন্তু একটি বাস্তব ও প্রাণপ্রদ বস্তু, কদাচ উহা পাণ্ডিত্যের উদ্দাম কল্পনা নহে)। উল্লিখিত ইংরাজী অংশটি আমার স্মৃতি হইতে লিখা, মূল কথার সহিত কিছু অমিল থাকিতে পারে।

চরিত্র বল

এই সংসারে জীবন-সংগ্রামের নির্ম্মম ঘাত-প্রতিঘাতে টিকিয়া থাকিতে হইলে যে একটা কঠোর সাধনলব্ধ শক্তিশালী চরিত্রবলের নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রফেসার ব্ল্যাকি অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত বাক্যটির দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—One thing is needful; money is not needful, power is not needful, cleverness is not needful, fame is not needful, liberty is not needful, even health is not the one thing needful, but character alone—a thoroughly cultivated will—is that which can truly save us; if we are not saved in this sense, we must certainly be doomed.—চরিত্রবল না থাকিলে মানুষের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি, কর্ম্ম, শক্তি, যশ—সব কিছুই বৃথা হইয়া যায়। আর সেই মানুষকে হালশূন্য নৌকার মত এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া, অতল জলে নিমজ্জিত হইতে হয়। কর্ত্তামহাশয় ইহা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই দেশে কতগুলি চরিত্রবলে বলীয়ান ছেলে গড়িয়া

তুলিবার আকাঙ্ক্ষা মনে লইয়া রামমালা ছাত্রাবাসের পরিকল্পনা করেন। কর্ম্মী নির্ব্বাচন হইলেই কর্ম্মপন্থা নির্ণয় হইবে, তাই তিনি সর্ব্বপ্রথমেই কর্ম্মী সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। ইঞ্জিন তৈয়ার হইলে কোন্ কাজে লাগিবে তাহা ভবিষ্যতের কথা। মোটকথা দেশে মানুষ নাই—মানুষ গড়িতে হইবে।

বিটঘর গ্রামের একদিকে জমিদার বাবুদের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত কীর্ত্তিকলাপ—বালাখানা, আসাসোটা পাইক-প্যাদা, মোসাহেব, উৎসব, গান, দরবার; অন্যদিকে সাহা-মহাজনদের অতুল বিত্ত, টাকাকড়ির ঝন্‌ঝনানি; মধ্যস্থলে গুটিকয়েক বিত্তহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। ব্রাহ্মণরা অনেক সময়ই বাবু মহাশয়দিগের মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করিয়া, আবার কেহ বা তাঁহাদের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া কোনমতে সংসার চালাইতেন।

বাল্যকালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা

তাঁহারা কোন কালেই সম্পন্ন ছিলেন না, বরং বেশ দরিদ্রই ছিলেন। গ্রামের জমিদার কায়স্থ, তাঁহাদের কুটুম্ব-আত্মীয় ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশের কায়স্থ বাবুরা। আমাদের দেশে কায়স্থ বাবুদের মধ্যেই ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী সভ্যতা, আনুষঙ্গিক ইংরেজী চালচলন প্রথম প্রচলিত হয়। বিটঘর বাবুদের বাড়ীতে ঐসব ভদ্র-মহোদয়গণের এবং জিলা ও মহকুমার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সমাগম হইত। এই সব ভদ্রমহোদয়গণের চালচলন, পোষাক পরিচ্ছদ এবং সম্মান ইত্যাদিতে মুগ্ধ হইয়া বাল্যকালেই কর্ত্তামহাশয়ের মনে ইংরেজি পড়িবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকিবে। আবার স্ব-সমাজের দৈন্য পরমুখাপেক্ষিতা এবং উভয় পার্শ্বের বাবুদের ও সাহা-মহাজনদের ঐশ্বর্য্য

দেখিয়া—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এই মূলসূত্র ধরিয়া ব্যবসায় করিয়া আর্থিক উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কুমিল্লা অবস্থান কালে তিনি প্রথম ছিলেন তাঁহার ভগিনীপতি দেওয়ান বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায়। বৈকুণ্ঠবাবু ছিলেন ত্রিপুরা ষ্টেটের দেওয়ান এবং বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। বৈকুণ্ঠবাবুর অধ্যয়ন স্পৃহা খুবই প্রবল ছিল। তাঁহার বাড়ীতে নিজের সংগৃহীত যে সুন্দর গ্রন্থাগার দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা এবং গ্রন্থ নির্ব্বাচন ধারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও নিয়ম-নিষ্ঠা সম্পন্ন লোক। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবও কর্ত্তামহাশয়ের উপর কিছু কিছু প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তারপর তিনি যান গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায়। গিরীশ বাবু ছিলেন একজন বিখ্যাত উকীল, যশ-মান-সম্মান, অন্নদান, আশ্রিত প্রতিপালন ইত্যাদি ছিল তাঁহার অপরিমেয়।

মাঠাকুরুণ ও মাসীমা

এমন উদার ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার লোক, অথচ ত্রিপুরা, ঢাকা, নোয়াখালী, চাটগাঁ, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি সকল জিলার লোকের জন্যই তাঁহার দ্বার ছিল অবারিত। এই পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখিয়াছি যে, কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে "না" বলিবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। গিরীশ বাবুর বাসায় বহুলোক আশ্রয় পাইত, কর্ত্তামহাশয়ও তাহাদেরই একজন। এই বাসায় থাকাকালে তিনি যে দুইটী মহৎ চরিত্রের সান্নিধ্যলাভ করেন তাঁহাদের ছাপ তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। একজন গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী, যাহাকে তিনি "মা" বলিয়া ডাকিতেন; আর একজন

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যালী; তাঁহাকে কর্ত্তামহাশয় "মাসীমা" বলিয়া ডাকিতেন। এই 'মা বা মাঠাকুরুণের' কথা পূর্ব্বে সামান্য উল্লেখ করিয়াছি, বিশেষ করিয়া বলিবার স্থান ইহা নয়। মাসীমা'র কথাও এখানে বেশী বলা সম্ভবপর হইবে না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এমন সেবাব্রতশীলা পূতচরিতা, মায়ামমতাপূর্ণ স্নেহশীলা নারী আমি আর দেখি নাই। সাধনা এবং সেবা এই দুইয়ের অপূর্ব্ব মিশ্রণ হইয়াছিল এই মহীয়সী মহিলার চরিত্রে। সন্ন্যাস এবং কর্ম্মের এমন যোগাযোগ কদাচিৎ দেখা যায়। গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃহৎ আট-চালা বৈঠকখানা ঘরে নানা দিগ্দেশাগত আত্মীয়, অনাত্মীয়, আশ্রিত লোকদের সকলের ছিলেন তিনি মাসীমা। এই মাসীমা সত্যই সকলের মাসী ছিলেন—আরামে, ব্যারামে, খাওয়া-দাওয়ায়, সকল বিষয়ে। ইঁহাদের চরিত্রের প্রভাবও কর্ত্তামহাশয়ের চরিত্রে আছে।

কুমিল্লা থাকা কালেই তিনি শ্রদ্ধেয় গুরুদয়াল সিংহ মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। গুরুদয়াল বাবু ছিলেন ব্রাহ্ম ও শিক্ষাব্রতী। তাঁহার পুস্তক ও ষ্টেশনারী দ্রব্যের একখানা দোকান ছিল। তিনি চরিত্রবান, ছাত্র-সমাজের বন্ধু এবং অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। কর্ত্তামহাশয়ের চিন্তা প্রণালী এবং চরিত্রধারা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় গুরুদয়াল বাবুর প্রভাব তাহার চরিত্র, শিক্ষা এবং সংস্কারের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। গুরুদয়াল বাবু, ডাঃ মহেন্দ্র নন্দী, পরম পণ্ডিত দ্বিজদাস দত্ত, শ্রদ্ধেয় আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন, মান্যবর কৈলাস চন্দ্র দত্ত উকীল মহাশয়—ইঁহারা ছিলেন কুমিল্লার তৎকালীন সমাজে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক। কেহ কেহ ব্রাহ্ম দীক্ষা প্রাপ্ত, কেহ কেহ

গুরুদয়াল সিংহ ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব

বা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন—সম্পূর্ণ কেশব সেনের যুগ। গুরুদয়াল বাবুর তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির এক সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কর্ত্তামহাশয় এই সভার একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন। গুরুদয়াল বাবুর বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা সভায়ও তিনি মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেন। আবার অবসর কালে গুরুদয়াল বাবুর দোকানে যাইয়াও বসিয়া থাকিতেন। সময় সময় স্বেচ্ছায় গুরুদয়াল বাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দোকানের টুক্ টাক্

দোকানদারীতে হাতে খড়ি

কাজও করিতেন। আমার মনে হয় গুরুদয়াল বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া কর্ত্তামহাশয়ের ধর্ম্মে ও আচারে উদারতা, চরিত্রে দৃঢ়তা এবং ব্যবসায়ে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। সাধারণ ব্যবসায়ীদের দোকানে দোকানদারীর ক, খ শিক্ষা না করিয়া গুরুদয়াল বাবুর মত শিক্ষিত, সৎ ও সাধু প্রকৃতি লোকের দোকানে তাহার দোকানদারীর হাতে খড়ি হওয়াতেই বোধ হয় তাহার ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ী জীবনের মূলসূত্র হইয়াছিল "Service and Honesty" (সেবা ও সততা)। গুরুদয়াল বাবুর সংস্পর্শে আসিয়াই কর্ত্তামহাশয়ের ব্রাহ্ম সমাজের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে। গুরুদয়াল বাবু এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ব্রাহ্ম, কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সহিতও তাঁহার যোগাযোগ ছিল। এই সূত্রেই কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের কাহারও কাহারও সহিত কর্ত্তামহাশয়ের পরিচয় হওয়া সম্ভব হয়। ফলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব তাহার চরিত্র, শিক্ষা এবং সংস্কারের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে ব্যবসায় করিবার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের পোষকতা তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল মনে করিবার হেতু আছে। ডাঃ

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচায্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম ডাক্তারগণ, এবং "নব্য ভারত" পত্রিকার-সম্পাদক—দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রমুখ ব্রাহ্ম মহোদয়গণের সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতার কথা আমি তাঁহার স্বমুখে শুনিয়াছি। ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থায় দেবী বাবু কর্ত্তামহাশয়কে টাকা ধার দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন। কর্ত্তামহাশয়ের চরিত্র গুণে ইহারা সকলেই কর্ত্তামহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

শ্যামলাল ঘোষ ও থাকমণি ঘোষ

কর্ত্তামহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন শ্যামলাল ঘোষ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী থাকমণি ঘোষ। কর্ত্তামহাশয় প্রায় সকল ব্যাপারে তাঁহাদের পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করিতেন। শ্যামলাল বাবু ছিলেন অবস্থাপন্ন জমিদার পর্য্যায়ের লোক। তিনি নিজে নানা প্রকার ব্যবসা করিতে গিয়া কোনটাতেই সফলকাম হন নাই সত্য কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। মা ঠাক্‌রুণের নিকট কর্ত্তামহাশয় অনেকবার বলিয়াছেন—"বুদ্ধি শ্যামবাবুর, কাজ করি আমি; শ্যামবাবুর মত অত বুদ্ধি কি কাহারও আছে?" শুনিয়াছি সময় সময় শ্যামবাবু কর্ত্তামহাশয়কে মূলধনও যোগাইতেন। শ্যামবাবুর প্রতি কর্ত্তামহাশয়ের যেমন খুবই শ্রদ্ধা ছিল, শ্যামবাবুও তেমনি কর্ত্তামহাশয়কে খুব ভালবাসিতেন। কর্ত্তামহাশয়ের বর্ত্তমান ১১নং সিমলা ষ্ট্রীটের (কলিকাতা) বাড়ীখানা শ্যামবাবুই নিজে থাকিবার জন্য করিয়াছিলেন। শেষে অবস্থা বিপর্য্যয়ে বাড়ীখানা বিক্রয় করিবার দরকার হইলে শ্যামবাবু বলেন—"মহেশবাবু, আমি অনেক চিন্তা ভাবনা এবং পরিশ্রম করিয়া নিজে থাকিব বলিয়া বাড়ীখানা করিয়াছি। বাড়ীখানা আমি এখন রাখিতে পারিতেছি না—আপনি যদি কিনেন তবে আমি খুবই শান্তি পাইব।" কর্ত্তামহাশয়ের এত ছোট বাড়ী

কিনিবার ইচ্ছা ছিল না—শ্যামবাবুর আগ্রহেই তিনি এই বাড়ী ক্রয় করেন। শ্যামবাবুর প্রশংসায় তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠ— মা ঠাকুরুণের নিকট শ্যামলাল বাবুর কথা বলিতে গিয়া তিনি যে শ্রদ্ধা এবং প্রীতির আবেগ দেখাইয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে পড়ে। ইহাতে কর্ত্তামহাশয়ের বন্ধুপ্রীতি এবং স্বভাব-সিদ্ধ কৃতজ্ঞতারই পরিচয় পাইয়া থাকি।

এই সমস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া কর্ত্তামহাশয়ের কৌলিক ও গ্রাম্য সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেকটা ব্রাহ্ম সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহাব চবিত্রে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ ছাপ ছিল বলিয়াই তিনি কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম্মমতের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যান নাই। তিনি সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়েব যাহা কিছু ভাল, বিচারপূর্ব্বক তাহা বাছিয়া লইয়া তবে গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে নিজেকে একটু সরাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিযাই মনে হয়। ইহার কারণ বোধ হয, ব্রাহ্ম সমাজের নূতন দলের মধ্যে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অন্তঃসার শূন্যতার আভাস তিনি পাইয়াছিলেন।

স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বলে সদা আত্মনিষ্ঠ

সাধারণতঃ গৈরিক বসনধারী সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তাহার ভক্তি বিশ্বাস ছিল না, বরং একটু অশ্রদ্ধাই ছিল। তবে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও হিন্দু মিশন প্রভৃতি সন্ন্যাসী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত সেবাকার্য্য চালাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে যে টাকা যে উদ্দেশ্যে দিতেন সেখানে সেই উদ্দেশ্যে উহা ব্যয়িত হইতেছে কিনা তাহা

শুধু মাত্র সাধু বেশ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন না

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ খবর লইতেন। সময় সময় নিজের লোককে টাকাকড়ি সহ তাঁহাদের সঙ্গে রাখিয়া তাঁহাদের নামে সেবা কার্য্য চালাইতেন। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে এবং বিহার ভূমিকম্পের সময় এই ব্যবস্থায় কাজ হইয়াছিল বলিয়া জানি। বস্তুতঃ দিয়া ফেলিলেই দান হয় এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল না; দানের দ্বারা সত্যকার কাজ হইল কিনা, ইহা দেখিবার মত আলস্যহীনতা এবং ধৈর্য্য তাঁহার ছিল। তাঁহার সকল কাজেই দেখিতে পাই পরিপূর্ণ প্রাণের সদাজাগ্রতভাব।

সাধু মহাপুরুষদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মানন্দ স্বামী, বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ; অন্য সম্প্রদায়ের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীরাম ঠাকুর এবং মা আনন্দময়ীর প্রতি তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত দেখিয়াছি। অন্যান্য যে সকল সাধু সজ্জন তাঁহার উপস্থিতিকালে কুমিল্লা মহেশ প্রাঙ্গণে আগমন করিয়াছেন তাহাদের অনেকের প্রতিও তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ছিল এমন প্রকাশ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু তিনি বলিতেন "আমি নিজে এসব ভাল বুঝি না তাই একটু দূরে থাকি, আর তাঁ'দের সময়েরও ত মূল্য আছে।"

খাঁটি সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা

এখানে একটা কথা না বলিলে কর্ত্তামহাশয়ের জীবন কথা আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এবং তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার একটু অসাধারণ ছিল মনে হয়। আমি কুমিল্লা নিবেদিতা বিদ্যালয় সম্পর্কে এবং অন্যান্য ব্যাপারে মেয়েদের সঙ্গে কর্ত্তামহাশয়ের আলাপ ব্যবহারে যে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব দেখিয়াছি তাহাতে বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহাদের অভাব অভিযোগ, আবেদন

নিবেদন শুনিতে গিয়া তাঁহাকে যে পরিমাণ কোমল এবং ধৈর্য্যশীল হইতে দেখিয়াছি-তাহাতে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তাঁহাব চরিত্র গঠনে দু চারজন মহীয়সী নারীর প্রভাব বিশেষরূপেই ছিল। মাতা রামমালা দেবী, "মা ঠাক্‌রুণ" স্বর্ণময়ী দেবী, "মাসীমা", দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী এবং বন্ধু গিরীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের মাতার প্রভাবের কথা আমি শুনিয়াছি। "মা ঠাক্‌রুণের" কথা যে কখনও লঙ্ঘন করিতেন না তাহা আমি নিজেই জানি, বরং কোন কোন সময় প্রত্যাদেশের মতই মান্য করিতেন।

তাঁহার চরিত্রে মাতৃজাতির প্রভাব

গর্ভধারিণী রামমালা দেবীর কঠোর কর্ম্মময় ব্রহ্মচারিণীর আদর্শ হইতেই যে প্রথম নিবেদিতা ছাত্রীনিবাসের জন্ম তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইহাকে হিন্দু বৈধব্য ধর্ম্মাচার ব্রতধারিণী বাল-বিধবাদের একটি আশ্রয় ও শিক্ষাস্থান রূপে গড়িয়া তোলা—এই কথা তাঁহার স্বমুখেও শুনিয়াছি। মা ঠাক্‌রুণ ছিলেন অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী পরদুঃখকাতর মহীয়সী মহিলা। তিনি যেমন কোনও আচার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না, তেমনি আবার এইসবের খুঁটি নাটি লইয়া হৈ চৈ করিতেও পছন্দ করিতেন না। কাহারও ন্যায়সঙ্গত স্বচ্ছন্দগতিতে একটুও বাধা হইবে, এমন কোনও কাজ তাঁহাকে করিতে দেখি নাই। কাজ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চিন্তা করিয়া দেখিতেন ইহাতে অপরের কোন অসুবিধা বা পীড়ার কারণ হইবে কিনা। তিনি লেখাপড়া বেশী জানিতেন না, সাধারণ বাঙ্গলা ভাষায় কিছু অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। ছোটবেলায় কেন, বড়

হইয়া শিক্ষকতা করিতেছি এমন সময়েও তাঁহাকে আমার প্রায়ই শিক্ষাপ্রদ পুস্তকাদি ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পড়িয়া শুনাইতে হইত। অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগ, অমিয় নিমাই চরিত এবং কালী প্রসন্নসিংহের মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীকে তিনি বড উচ্চস্থান দিতেন। তাঁহারই সংস্পর্শে এবং স্নেহে আমি বাল্য এবং যৌবন কাটাইয়া আজ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এমন উদার দৃষ্টি আমি তখনকার দিনে আর কোন মহিলার দেখি নাই। বাইবেল হইতে বাছিয়া বাছিয়া উপদেশাবলী বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া আমি তাঁহাকে শুনাইলে তিনি খুব আগ্রহের সহিত শুনিতেন। এমন মহীয়সী মহিলার পূত চরিত্রের প্রভাব যে কর্ত্তামহাশয়ের মধ্যে বিশেষভাবেই ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিধাতার বিধানে সত্যকে দেখিতে পায় প্রায় সকলেই কিন্তু সত্যের আলোক সহ্য করিবার শক্তি অনেকেরই নাই। সত্যকে আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার শিক্ষা, সাধনা ও চরিত্রবল অতি অল্প লোকেরই আছে।

বীরের বীরত্ব

কলিকাতা সদর রাস্তায় মেথর ছেলেরা একে একে ময়লার গর্ত্তে ঢুকিয়া আর বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বিষাক্ত গ্যাসে তাহাদের শ্বাসরোধ হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে শত শত লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া 'গেল গেল' চীৎকার করিতেছে, কিন্তু কেহই কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছে না। এমন সময় কোথা হইতে বীর হৃদয় নফরকুণ্ডু ছুটিয়া আসিয়া একটুও ভাবনা চিন্তা না করিয়া, কিছু না বলিয়া না কহিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিবার তাহার সময় ছিল না—এখানেইত বীরের বীরত্ব। তাই মেটারলিঙ্ক বলিয়াছেন—

It is not enough to possess truth, it is essential that the truth should possess you (তুমি সত্য অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইল না, সত্য তোমাকে অবলম্বন করিবে, ইহাই সার কথা)।

একটা কোন বড রকমের কাজ হইয়া গেলে আমাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন—আমি ত এরূপ ভাবিয়াছিলাম, আমিও ত এরূপ বলিয়াছিলাম, ইত্যাদি। কর্ম্মহীন ভাবনা বা ফাঁকা বুলির কোন মূল্য নাই। ভাবনা ও বাক্য যেখানে কর্ম্মে রূপায়িত সেখানেই উহার বিশেষত্ব ও মহত্ব। বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত, অস্পৃশ্যতা পরিহার কর্ত্তব্য, দেশের জন্য সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে—এমন কত সব ঔচিত্যই যে প্রতিনিয়ত আমাদের অনেকেরই প্রাণে জাগে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দেশে কয়জন বিদ্যাসাগর, কয়জন চিত্তরঞ্জন, কয়জন লালা গঙ্গারাম, কয়জন মহেশচন্দ্র হইয়াছে ? কর্ম্মের সহিত যোগ না রাখিয়া নিরর্থক শূন্য চিন্তা, এবং শূন্য কল্পনা দ্বারা কল্পনার বিলাস মাত্রই প্রকাশ প্রায়। সেজন্যই ঋষি কার্লাইল লিখিয়াছেন—The end of man is action, not a thought though it were the noblest (কর্ম্মেই মানবের পরিপূর্ণতা, কেবল বড কথা চিন্তা করিলেই ফল হয় না)। কর্ত্তামহাশয়ের মধ্যে চিন্তার বিলাস বিন্দু মাত্রও ছিল না।

কথাবার্ত্তায় মনে হইয়াছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কর্ত্তামহাশয়ের খুবই শ্রদ্ধা ছিল। ভূদেব বাবুর "পারিবারিক প্রবন্ধ", "আচার প্রবন্ধ", "সামাজিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি পুস্তকগুলি তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত পড়িতে দেখিয়াছি। ভূদেব বাবুর এক প্রবন্ধে আছে—বাড়ীতে অতিথি আসিলে অতিথির জন্য অতিরিক্ত জিনিষ বাজার হইতে কিনিয়া না আনিয়া

বাড়ীর প্রত্যেকের ভাগ হইতে কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে বাড়ীর সকলেরই অতিথি সেবার ফল হইবে, বাড়ীর শিশুরাও অতিথি সেবার শিক্ষা পাইবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

এই কথাটা কর্ত্তামহাশয়ের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, এই প্রবন্ধাংশটুকু দুই তিন দিন তিনি আমাকে পড়িতে দিয়াছেন। আজন্ম শিক্ষাব্রতী ভূদেব বাবু তেমন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যার জন্য তিনি যে দান করিয়া গিয়াছেন তাহা একান্তই অসাধারণ। এমন দান বাংলাদেশে কমই আছে।

আচার্য্য পি. সি. রায় বয়সে কর্ত্তামহাশয়ের বড় কি ছোট ছিলেন তাহা জানি না। কিন্তু কর্ত্তামহাশয়ের প্রতি আচার্য্য দেবের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। শেষ বয়সে আচার্য্যদেব অনেক সময় পানিহাটি বেঙ্গল কেমিকেলের কারখানার একটা বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি মাঝে মাঝে কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার্সে যাইয়া বৌ-ঝিরা কি রান্না-বান্না করে, ঘর-দুয়ার, ড্রেণ-পায়খানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে কিনা, বিছানা জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখে কিনা, ছেলে মেয়েদের জামা কাপড় ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতেন। সঙ্গে কিছু খেলনা, সাবান, বিস্কুট, কমলা ইত্যাদি থাকিত—তাহা ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝিদের দিতেন। আমার এক ভাই পো অনেক দিন যাবৎ পানিহাটি কারখানায় কাজ করে। একদিন আচার্য্য রায় তাহার বাসায় গিয়া বৌ-ঝি, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাঁহার অভ্যস্ত খেলা খেলিয়া ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়া খুবই খুসী হইলেন। তারপর তিনি

আচার্য্য পি, সি, রায়ের কর্ত্তার প্রতি শ্রদ্ধা

আমার ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে, তোর দেশ কোথায়?" উত্তরে যখন জানিলেন দেশ কুমিল্লায়, তখন আচার্য্যদেব উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"কুমিল্লা বড় মস্ত জায়গা, সেখানে সব বীর—মহেশ ভট্টাচার্য্য কুমিল্লার মানুষ, একটা মানুষের মত মানুষ, একটা জ্যান্ত সিংহ। তোর কিছু হয় না কি?" আচার্য্যদেবের অনেক প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় কর্ত্তামহাশয়ের উল্লেখ আছে দেখিয়াছি।

মিঃ এন. এম. খান আই. সি. এস. মহোদয়ের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। তিনি একজন অতিশয় দক্ষ ও বুদ্ধিমান রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার মত নিরলস কর্ম্মী আমরা কমই দেখিয়াছি। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার S. D. O. রূপে তিনি প্রথম বাংলাদেশে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার এলাকান্তর্গত বিটঘর গ্রামের খ্যাতনামা পুরুষ মহেশচন্দ্রের মহত্ত্বের কথা অবগত হইয়া বিন্ধ্যাচলে তাঁহার নিকট পত্র দেন। তখনকার দিনে আই. সি. এস. অফিসারগণ সাধারণতঃ বেসরকারী মহল হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু গুণগ্রাহী মিঃ খান সেই রীতি ভঙ্গ করিয়া বাংলা ভাষায় মহেশচন্দ্রের নিকট প্রথম যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার নকল অপর পৃষ্ঠায় দিলাম। তাহার পর তাঁহাদের মধ্যে বহু পত্রালাপ হইয়াছিল এবং সড়ক, লৌহ সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও খাল খনন, পুষ্করিণী সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে—মিঃ খানের আন্তরিক সহযোগিতা মহেশচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন।

মিঃ এন এম খান মহোদয়ের শ্রদ্ধা

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৮-৮-৩৪ইং

মহাশয়,

অনেক দিন থেকে আমার মনে ছিল যে আমি আপনার নিকট চিঠি লিখব কিন্তু আমি বাংলা একেবারে কম জানি তাই ভুলের ভয়ে আমি লিখিতে সাহস করি নাই। আমি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি এইজন্য আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে অনেক ইচ্ছা হইয়াছিল। রায় সাহেব নীলকুমারকেও বলিলাম তিনি যেন আপনাকে এই সম্বন্ধে লিখেন। তিনি আজ দু'দিন হইল খবর দিলেন যে, এখন আপনার বিটঘরে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই এই চিঠিদ্বারা আপনার সঙ্গে এখন আলাপ করছি।

তিন দিন হইল আমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আপনার গ্রামে গিয়ে সকলকে জানাইয়া এলাম যে আমরা দুইটি রাস্তা এইবার ঠিক করাইতে চাই যেন কেহ আপত্তি করিবেন না। এখন আমি নিজের সার্কেল অফিসারকে এমন লোকের লিষ্টি তৈয়ার করিতে বলেছি যারা কোন আপত্তি করিবে। তার মধ্য থেকে আমি প্রত্যেককে ডেকে আপত্তি হারাইবার (খণ্ডনের) চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় আর আপত্তি কেহ করিবে না।

মহেশবাবু আপনি নিজে বুদ্ধিমান লোক। আপনাকে আমি কি বলব। আপনাকে কোন কোন সময় তো নিজের গ্রামে পাওয়া উচিত। যদি সেটা হইতে পারে তা হইলে আমার মনের ইচ্ছাও পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমাদের মুসলমান ধর্ম্মের বইতে লিখা আছে যে কোন ভাল ব্যক্তির দেখা সাক্ষাৎ করা একবার মক্কা যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল। তাই আমি এত জোর আপনাকে অনুরোধ করছি। আমার এইখানে থাকাতে যদি আপনার এদিকে আসা হয় তা হইলে আমি নিজকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করিব।

আমার লিখিত ভুল ক্ষমা করিবেন। ইতি—

নিয়াজ মহাম্মদ খাঁ
সব ডিভিসনাল অফিসার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

একবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশন হয় কুমিল্লাতে। দানবীর মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ছিলেন প্রধান অতিথি। সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের নানা স্থান হইতে অনেক সম্মানিত বৈষ্ণব মহাজন এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহেশ প্রাঙ্গণই ছিল অধিবেশনের স্থান। বিরাট উৎসব, বিরাট আয়োজন—কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা, বৈষ্ণব সেবা, সব কিছু চলিয়াছে মহাসমারোহে। কর্ত্তামহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এই বিরাট যজ্ঞের কোষাধ্যক্ষের কাজ। অতি শৃঙ্খলার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ খবর লইয়া আমাদের দ্বারা টাকাকড়ি রাখা ও হিসাব লেখার কাজ চালাইয়াছেন। কর্ত্তামহাশয় কিন্তু সম্মানিত অতিথিদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বা তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন করিতে না গিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য এবং সাধারণভাবে সকল কাজেরই

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক "যথার্থ বৈষ্ণব" আখ্যা দান

খোঁজ খবর ও তদ্বিরে নিযুক্ত আছেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিন মহারাজ বাহাদুর জন কয়েক স্থানীয় উকিল কর্ম্মকর্ত্তাকে লইয়া, "যাঁহার বাড়ীতে আসিলাম সেই মহেশবাবুকে ত দেখিলাম না" বলিয়া কর্ত্তামহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। কর্ত্তামহাশয় ত সঙ্কোচ ও লজ্জায় মহা বিব্রত। এত বড় সম্মানিত রাজ অতিথি সম্মুখে উপস্থিত; অতি মাত্রায় কুণ্ঠিত হইয়া তিনি বলিলেন—"মহারাজ, আমি দোকানদার মানুষ, ধর্ম্মের কিছুই আমি ভাল বুঝি না—একটা কিছু কাজ লইয়াই থাকি ভাল"। মহারাজ বাহাদুর তদুত্তরে বলিলেন—"আপনি জানেন সব, আপনিই যথার্থ বৈষ্ণব। এতবড একটা কাজের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়াও আপনি নিজেকে আশ্চর্য্যভাবে লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন—আজ দুদিন আপনাকে দেখিব মনে করিতেছি, কিন্তু আপনার দেখা পাই নাই।" এই বলিয়া মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তামহাশয়কে লইয়া ভিতর বারান্দার দিকে যাইয়া একত্র ফটো উঠাইলেন।

বৈষ্ণবোচিত দীনতা কাহাকে বলে জানি না, সাহিত্যে মাত্র পড়িয়াছি। কিন্তু কাজের সহিত এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াও নিজকে প্রকাশ হইতে না দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত খুবই কম। মহারাজ বাহাদুর ছিলেন মহাপণ্ডিত। কর্ত্তামহাশয়ের ভাবগতিক এবং কার্য্য কলাপ দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার মনে হইয়া থাকিবে, চৈতন্যচরিতামৃতকার ভক্ত পণ্ডিত কবিরাজ গোস্বামীর বৈষ্ণব লক্ষণের কথা—

বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ,
তবু আপনাকে মানে তৃণ হতে হীন।

তাই তিনি কর্ত্তামহাশয়কে সত্যকার বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কর্ত্তামহাশয়ের মধ্যে আমরা কখনও "মর্কটবৈরাগ্য" দেখি নাই। অন্তরে

মাল্যভূষিত মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী ও মহেশচন্দ্র
(কুমিল্লা মহেশপ্রাঙ্গণে বৈষ্ণব সম্মিলনীর সময় গৃহীত ফটো)

নিষ্ঠা, বাহিরে লোক ব্যবহার এবং অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতেই দেখিয়াছি। সত্যকার বৈষ্ণবের ইহাই ত লক্ষণ (চৈ, মধ্য, ১৬)।

কর্ত্তামহাশয়ের চরিতকথা আলোচনা করিতে গিয়া আমি দেশবিদেশের মনীষিগণের গ্রন্থাদি হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছি।

সকল মহাপুরুষেরই চিন্তাপ্রণালী এক

আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি—স্কুল কলেজের বিশেষ শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও এই মহাপুরুষের চিন্তা এবং ভাবধারার সহিত বিভিন্ন দেশীয় বিশিষ্ট কবি, ভক্ত এবং পণ্ডিতদের ভাবধারা ও চিন্তার এমন সামঞ্জস্য হইল কেমন করিয়া! ইহাতে All great men think alike (সকল মহাপুরুষই চিন্তায় অভিন্ন) এই বাক্যেরই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। বাস্তবিকই মহাপুরুষদের চিন্তা এবং কার্য্যের ধারা দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াই চলে। তাঁহারা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের—কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ বা কালের নহেন।

কর্ত্তামহাশয়ের চরিত্রের আরও একটা দিক আলোচনা না করিলে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। সেই দিকটা হয়ত অনেকেরই

রসিক মহেশচন্দ্র

অজানা—উহা এই সদা কর্ম্মনিরত গম্ভীর প্রকৃতি লোকটির চটুল রস প্রাচুর্য্য। অধিকাংশ লোকই তাঁহার নিকট কাজের জন্য আসিয়া কাজ সারিয়া চলিয়া যাইত। কাজের কথা ভিন্ন অন্য আলাপ করিবার সুযোগ ঘটিত না। আমরা অনেক সময়ই কাছে কাছে থাকিতাম, অনেক সময় অনেক কাজে এবং কথায় এমন সব রসাল মন্তব্য তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি যে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতাম, এত কথাও তিনি জানেন!

একদিন একটা লোক আসিয়া কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়াই তাঁহার

পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি আপনি পূর্ব্ব জন্মে আমার বাবা ছিলেন, আপনার প্রসাদ লইলে আমার মঙ্গল হইবে"—ইত্যাদি। কর্ত্তামহাশয় তদুত্তরে কিছু পয়সা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"তুমি যে এতটা করিতে পারিয়াছ তার জন্য তোমার সদ্য মঙ্গল হইল এই পয়সা। এখন যাও হোটেলে গিয়া খাও, আর তোমার ঠাকুরকে বলিও তিনি যেন আমাকেও স্বপ্ন দেখান, কেবল তোমাকে স্বপ্ন দেখাইলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।"

আর একদিন কি একটা জিনিষ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"তোমার দিদিকে ইহা দিয়া আসিও আর বলিও ইহা যেন খুব যত্ন করিয়া রাখেন, দরকার পড়িলে যেন না পাই।" কথাটা প্রথম বুঝি নাই। পরে বুঝিলাম কি একটা জিনিষ রাখিতে দিয়া কাজের সময় না পাওয়ায় এখন এই উপহাস করা হইল।

কর্ত্তামহাশয়ের কাছে দিদির কথা বলিতে আমি সাধারণতঃ কর্ত্রী বলিয়াই উল্লেখ করিতাম। উহাতে একদিন তিনি আমাকে বলেন—"তুমি কর্ত্রী কর্ত্রী বল কেন? দিদি বলিতে কি লজ্জা করে?" আমি বলিলাম, "শ্যালা হইতে আমার বাস্তবিকই লজ্জা করে; বড় লোকের শ্যালা হইতে অপমানই বোধ হয়।" ইহার পর তিনি চুপ করিয়া গেলেন—কিন্তু পরে যখনই তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমার পরিচয় দিতে হইত তখনই তিনি বলিতেন—"ইনি আমার শ্যালক, আপন না হইলেও ঘনিষ্টতায় আপনার চেয়ে বেশী।" আমি কাছে থাকিলেই যেন একথাটা বেশী করিয়া বলিতেন। পূর্ব্বে একজায়গায় লিখিয়াছি, তিনি সহজে কোন কথা ভুলিতেন না, এক্ষেত্রেও তাহা দেখিতে পাই। এসব খুবই ছোট খাট কথা। কিন্তু কঠিন পর্ব্বতের মধ্য দিয়াও যে মধুর স্নিগ্ধ

প্রস্রবণ বহিয়া যায় তাহা বুঝাইবার জন্যই এই সব ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করিলাম, আশাকরি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কর্ত্তামহাশয়েব মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল যে তিনি ত্যাগশীল গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে। তাঁহাব পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়দিকের পূর্ব্বপুরুষরাই ছিলেন বিদ্যাদান-ব্রতী, ঐহিক সম্পদ-বিমুখ ব্রাহ্মণ। তিনিই প্রথম তাঁহার বংশে বংশানুক্রমিক অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন-ব্রতী হইয়া বৈশ্যোচিত কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। এজন্য তিনি অন্তরে একটা বিরাট দৈন্য এবং যাতনা অনুভব করিতেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কর্ত্তামহাশয় নিজমুখে অনেকদিন তাহা প্রকাশও কবিয়া গিয়াছেন। একবার, বোধ হয় ইংরেজী ১৯২৬ সনে কর্ত্তামহাশয় এবং প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত মেঘনাদ সাহা মহাশয় একই সময়ে দার্জ্জিলিং লুইস্‌জুবিলী স্যানিটরিয়মে ছিলেন। উভয়েই উভয়ের নাম জানিতেন, সাক্ষাৎ আলাপ পবিচয় ছিল না।

ব্রাহ্মণ হইয়া বৈশ্যোচিত বৃত্তি অবলম্বনজনিত ক্ষোভ এবং বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহার সহিত কথোপকথন

তাঁহাদের একদিনকার কথোপকথন সম্পর্কে মেঘনাদসাহা মহাশয়ের নিজের লেখা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে তাঁহাব ঔদার্য্য, দানশীলতা ইত্যাদি গুণের প্রশংসা করিয়া বলি যে, তিনি যাবতীয় ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী। তিনি কথা ফিরাইয়া নিয়া বলেন—আমি লেখাপড়া সামান্যই শিখিয়াছি, সুতরাং আপনার প্রশংসার অযোগ্য। তিনি আমাকে বলেন যে আপনি সাহাকুলে জন্মিয়া ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সাহাদেব মত দোকানদারী করিতেছি।"

আমরা আরও শুনিয়াছি যে কর্ত্তামহাশয় সহাস্যে বলিয়াছিলেন—"আসুন আমরা পরস্পর পদবী বদলাই, আপনি হন মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য আর আমি হই মহেশচন্দ্র সাহা।"

রামমালা ছাত্রাবাস এবং বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রেরণাও এই মনোভাবের প্রকাশ। তাঁহাকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি—"পর জন্মে যেন ব্রাহ্মণ হই এবং ব্রাহ্মণ্য বৃত্তি অধ্যয়ন অধ্যাপনা লইয়া যেন শান্তিতে থাকিতে পারি।"

ঐহিক ঐশ্বর্য্য-বিমুখ পূর্ব্বপুরুষদের রক্তকণিকা হইতেই যে তাঁহার অন্তরে ত্যাগশীলতার সৃষ্টি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অর্থে অনাসক্তি

বাল্যে দারিদ্র্যপীড়নে অর্থাভাব মোচনের স্পৃহা হইতে অর্থলাভাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল, এবং অর্থের জন্য নানাদিকে নানাপ্রকার কঠোর সাধনা তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের ব্রাহ্মণোচিত ভাবধারাই অর্থের প্রতি অযথা আসক্তি তাঁহার মনে জাগিতে দেয় নাই। পরবর্ত্তীকালে দেখিয়াছি অর্থ বেশী জমিলেই খরচ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন। ব্রাহ্মণ মানুষের এতটাকা কেন—এই যেন ছিল তাঁহার অন্তরের প্রশ্ন। পুত্র শ্রীমান হেরম্বকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক দিন কর্ত্তামহাশয আমাদিগকে বলিয়াছেন—"দান না করিলে কিছুই থাকিবে না।"

কর্ত্তামহাশয়ের যে কেবল অর্থব্যয়েই ত্যাগশীলতা দেখিতে পাই তাহা নয়। তিনি ছিলেন কর্ম্মী, কর্ম্মের প্রতি প্রবল আগ্রহ তাঁহার সারা জীবন ভরিয়াই দেখিয়াছি। কিন্তু এই কর্ম্মকোলাহলের অন্তরালে যে একটা প্রকাণ্ড সন্ন্যাস-বুদ্ধি ছিল তাহার সন্ধান আমি অনেকবার পাইযাছি। এখানে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

কুমিল্লা বাড়ীর উত্তরের কি পশ্চিমের দালান হইতেছে, আমার ঠিক মনে নাই। অনেক রাজ-যোগালী আইনদ্দি ওস্তাগারের তত্ত্বাবধানে কাজ করিতেছে। কর্ত্তামহাশয় নিমা গায়ে গামছা মাথায় ছাতি হাতে করিয়া সারা দিন রাজ মজুরের পেছনে পেছনে ঘুরিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে কাজ শেষ হইলে রাজ-যোগালীরা বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছে। কর্ত্তামহাশয়ও তাঁহার ঘরেফিরিয়া আসিতেছেন। এমন সময় আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এই সব কিছুই না।" কথাটা টেনিসনের Hollow, hollow all delight (এই সব আমোদ-আহ্লাদ সবই অসার) কথাটার মত আমার কানে বাজিল। তাঁহার প্রাণের সত্যকার কথা ছিল—এই সব কিছুই না। তিনি কর্ম্মবহুল দীর্ঘজীবন উদ্‌যাপন করিয়া বুঝিয়াছিলেন ঐহিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত যাবতীয় কর্ম্ম অকর্ম্মেরই নামান্তর।

ঐহিক কর্ম্মের অসারতা বোধ

আব একদিনের একটা কথা বলিতেছি। বিন্ধ্যাচল বাড়ীর উত্তরের কোঠায় তিনি রোগশয্যায় শয়ান, নিকটে কেহ নাই। আমি বারান্দায় বসিয়া কি একটা কাজ করিতেছি। এমন সময় কর্ত্তামহাশয় আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে ইসারা করিলেন। আমি তাঁহার বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার বিছানা যে খাটে ছিল তাহা হইতে অনতিদূরবর্ত্তী গঙ্গার বালুকাময় সৈকতভূমি মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, পাশেই ফাল্গুনের গঙ্গার গাঢ় নীল জলধারা এবং অপর পারে ঘন সবুজ বৃক্ষশোভিত গ্রাম ইত্যাদি লইয়া একটা অপূর্ব্ব ছবি চোখের

সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তাহার অন্তরালে ভগবৎকর্ত্তৃত্বের উপলব্ধি

সামনে পড়িয়াছিল। এই ছবি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া তিনি ছেলেবেলার পড়া একটা কবিতার দুই ছত্র আবৃত্তি করিলেন। আমি তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং সৌন্দর্য্যের অন্তরালে ভগবৎকর্তৃত্বের উপলব্ধির কথা ভাবিয়া আজও চমৎকৃত হই। কবিতার পংক্তি দুটি :—

Can the guilded gaudy room,
Equal the fields in summer bloom ?

বহু কারুকার্য্য খচিত কক্ষ কি কখনও ভগবৎসৃষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমতুল হয় ?

কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

বাঁধিও আমায় যত খুসী ডোরে,
মুক্ত রাখিও তোমা পানে মোরে।

কবির এই আকাঙ্ক্ষা মহেশচন্দ্র দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। ভাবিয়া আকুল হই, আইন শৃঙ্খলা, কাজের তাড়াহুড়া, ঐশ্বর্য্যের ঝঞ্ঝাট ইত্যাদির অন্তরালে কি এক মহান্ অন্তঃকরণ কর্ত্তামহাশয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল; কত গভীর, শান্ত ও সুন্দর ঐ অন্তঃকরণ। উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুলিত সমুদ্রের অন্তস্তল কত শান্ত। কত ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের সমাবেশ সেখানে! সমুদ্রের ঢেউ, তাহা ত উপরের নিতান্ত ভাসা জিনিষ। সত্যকার মহৎ যিনি, কর্ম্মসম্ভার, ঐশ্বর্য্য, যশ, খ্যাতি ইত্যাদিও তাঁহার একান্ত বাহিরের জিনিষ। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজিত থাকে—সত্যং শিবং সুন্দরং শান্তং অদ্বৈতম্।

বাহিরে কর্ম্ম কোলাহল,
অন্তরে শান্তি

পরিশিষ্ট

মহেশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক জীবনেতিহাস

পূজ্যপাদ মহেশচন্দ্রের চরিত কথা কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এবং আমাদের স্কুল সংশ্লিষ্ট স্নেহাস্পদ ছাত্র বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। উহা যে এতবড় হইয়া পড়িবে তাহা প্রথম ভাবি নাই। স্মৃতি-বার্ষিকী সভায় পঠিত হইবার উপযুক্ত প্রবন্ধ হইবে এরূপ মনে করিয়াই প্রথম লিখিতে আরম্ভ করি। উহা মহেশচন্দ্রের ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস নহে, গুণমুগ্ধ সেবকের গুণালোচনা মাত্র। বহিরঙ্গ কেহ ইহা পাঠ করিলে মহেশচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী বুঝিতে অসুবিধা হইবে মনে করিয়া তাঁহার "আত্মকথা" হইতে সংগ্রহ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস এই পুস্তকে সংযুক্ত করিয়া দিলাম। চিন্তা, কর্ম্ম ও দানে সদা গোপনচারী এই মহাপুরুষের লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের পরিপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে হইলে যে পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন তাহা আমার নাই। নানা প্রকার কঠোর বাধাবিঘ্ন, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ-শোক এবং অকৃতকার্য্যতাকে—সাহস, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় গুণে অতিক্রম করিয়া তিনি কি ভাবে অতি নিম্নস্তর হইতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন তাহার একটু আভাস মাত্র এখানে দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নূরনগর পরগণার বিটঘর গ্রামে ১২৬৫ বাং সনের ১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিভাবান

পণ্ডিত ছিলেন। নানা স্থান হইতে আগত প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্রও তাঁহার টোলে সময় সময় অধ্যয়ন করিত। তিনি সচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজনই ছিল তাঁহার বৃত্তি। এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই নিজের সংসার এবং তদতিরিক্ত ২০।২৫ জন পড়ুয়ার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে নিজ বাড়ীতেই করিতেন। মহেশচন্দ্রের মাতা রামমালা দেবীই ঘরের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া এই সকল পড়ুয়াকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইতেন। রামমালা দেবী গ্রামেরই পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ শিরোমণি মহাশয়ের কন্যা। তিনি স্বধর্ম্ম পরায়ণা, পরিশ্রমশীলা এবং অত্যন্ত কড়াপ্রকৃতির মহিলা ছিলেন। আবার আচার-নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবোধ এবং ন্যায়-বুদ্ধি তাঁহার এত প্রখর ছিল যে গ্রামের ছোট বড় সকলেই তঁহাকে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের চক্ষে দেখিত।

ঈশ্বরদাসের দুই পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ—আনন্দ চন্দ্র ও কনিষ্ঠ মহেশচন্দ্র। আনন্দ চন্দ্রের সাত পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। উক্ত সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য এবং পঞ্চম কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

পাঁচ বৎর বয়সে মহেশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়, ছয় বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। মাতামহের আশ্রয়ে কোনও মতে কয়েক বৎসর কাটিল। তারপর দশ বৎসর বয়সের সময় মাতামহও পরলোক গমন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহাদের ঘোর দারিদ্র্যের সময় আরম্ভ হয়।

তখনও মহেশচন্দ্রের লেখাপড়া আরম্ভ হয় নাই। যথাসাধ্য মায়ের সংসারের কাজ করিতেন মাত্র। কাজই বা কি? দরিদ্র মায়ের জ্বালানীর জন্য বাঁশপাতা অথবা বিলের ক্ষেত হইতে নাড়া (খড়)

আনিয়া দেওয়া, দু-এক পয়সার বাজার করিয়া দেওয়া, অথবা মাতার জন্য দু-এক ঘটী জল তুলিয়া আনা ইত্যাদি কাজ করিতেন, আর অন্য সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন। লেখাপড়ার তাগিদ দিবার লোক ছিল না। এমনি ভাবে কিছু দিন গেল। পরে সমবয়স্ক ছেলেরা সকলেই লেখাপড়া করে দেখিয়া মনে হইল তাঁহারও লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য। তখন তিনি গ্রামেই গোপালবাবুর অবৈতনিক পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পর গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ছাত্রবৃত্তি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন। সেই শ্রেণীই তখনকার স্কুলের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী ছিল। তারপর তিনি শহরে যাইয়া পড়িবার আশায় ১২৭৮ সালে কুমিল্লা যান।

শৈশব হইতেই বাণিজ্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা

কুমিল্লায় তখন রেল হয় নাই, যাতায়াত কষ্টকর ছিল। সুতরাং বিশেষ অবস্থাপন্ন না হইলে তখন অনেকেই শহরে পরিবার নিয়া থাকিত না। বেতনভোগী পাচক রাখিবার প্রথাও ছিল না; কোন কোন বাসায় গরীব ব্রাহ্মণের ছেলেরা কয়েকজনের রান্না করিয়া তাহার বিনিময়ে খোরাক পাইয়া পড়াশুনা করিত। কুমিল্লা যাইয়া মহেশচন্দ্রও পাঁচ ছয় জনের রান্না করিয়া খোরাক, স্কুলের বেতন এবং পুস্তকাদির মূল্য পাইয়া এক ভদ্রলোকের বাসায় থাকিয়া পড়ার ব্যবস্থা করিয়া লন। এখানে কাজ ছিল বেশী, পড়িবার সময় কম পাইতেন। তাই তিনি কিছুদিন পরেই কুমিল্লার তৎকালীন প্রসিদ্ধ উকীল গিরীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। পূজনীয় গিরীশ বাবু মহেশ চন্দ্রের খোরাক এবং ছয় মাসের স্কুলের বেতন দিতে রাজী হইলেন। এই বাসায় রান্না করিবার অনেক লোক ছিল,

বিশেষতঃ বাড়ীব স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই দিনে রান্না করিতেন। সুতরাং পাকের পালা অনেক বিলম্বে পড়িত। গিরীশ বাবু এবং তাঁহার পরিবারস্থ লোকজনের কথা পূর্ব্বে অনেক উল্লেখ করা হইয়াছে। গিরীশ বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী (বর্ত্তমান class IX) পর্য্যন্ত পড়াশুনা কবেন। কেবল নিজের খোরাক এবং পড়াশুনা নিয়া থাকিলে চলিবে না; মা যে একা আর দুইটি শিশুকে নিয়া বাড়ীতে আছেন তাহাদিগকে খাওয়ায় পরায় কে? এই সকল চিন্তায় অস্থির হইয়া তিনি ব্যবসায় করিয়া অর্থ রোজগারের আশায় বিদেশে যাইতে মনস্থ করিলেন। অগ্রজ আনন্দ ভট্টাচায্য বয়সে কয়েক বছর বড় হইলেও তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কার অর্থ রোজগারের মত নয়—বয়সও ত তেমন কিছু বেশী ছিলনা।

কলিকাতা যাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া দারিদ্র্য দূর করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি প্রথমেই কলিকাতা যাইবেন মনে করিয়া রওয়ানা হন। কুমিল্লা হইতে ইলিয়টগঞ্জ, নারাযণগঞ্জ, ফতুল্লা, সাভার, মানিকগঞ্জ, উথলি প্রভৃতি জায়গা হইয়া কখনও বা পায় হাঁটিয়া কখনও চল্‌তি নৌকায় উঠিয়া গোয়ালন্দ যান। সেখান হইতে রেলে কলিকাতা পৌছেন। পরবর্ত্তী জীবনে কথা প্রসঙ্গে দাসরা, জয়মণ্টপ প্রভৃতি স্থানের কথা উঠিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনি এ সব জায়গা হাঁটিয়া গেলেন কেন? তখন ত নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ ষ্টীমার ছিল।" তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"ষ্টীমার জাহাজ সবই ত ছিল, কিন্তু পকেটে পয়সা ছিল না।"

তখন কলিকাতা মেছুয়া বাজারে ত্রিপুরা জেলার ছাত্রদের একটি মেস্ ছিল। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ

মনোরথ হন। হাতের টাকা ফুরাইয়া গেলে, তিনি গোয়ালন্দ হইয়া মহাজনের নৌকায় ঢাকা ফিরিয়া আসেন। এইরূপে তাঁহার প্রথম কলিকাতা যাত্রা নিষ্ফল হয়।

মহেশচন্দ্রের ভগিনীপতি শ্যামগ্রামের গগন ভট্টাচায্য মহাশয় জনাইর জমিদার মুখার্জ্জীদের বরিশাল বুড়ামজুমদার-কাচারীর নায়েব ছিলেন। মহেশচন্দ্র চাকুরির আশায় পানের মহাজনের নৌকায় টরকী হইয়া বুড়ামজুমদার গেলেন। কিন্তু কাজ হইল না। কয়েকদিন বুড়ামজুমদার ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া ফিরিযা আবার কুমিল্লা আসেন। তারপর তিনি সকল দিকে হতাশ হইয়া দেশত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে যাইতে মনস্থ করিয়া আকিয়াব যান। সেখানেও তিনি কোন কাজ কর্ম্মের সুবিধা করিতে পারিলেন না। তৎপর একটা কাল্পনিক চাকুরির আশায় আকিয়াব হইতে ষ্টীমারে কলিকাতা যান। কিন্তু চাকুরি না হওযায় আবার বুড়ামজুমদার ভগিনীপতি গগন বাবুর নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন। রেলে গোয়ালন্দ যাইয়া পদ্মার পশ্চিম পাড় বাহিয়া হাঁটিয়া ফরিদপুর, তাল্‌মা, কালামৃধা, মাদারীপুর, গৌড়নদী, গৈলা, রহমতপুর, লাকটিয়া, পটুয়াখালী হইয়া বুড়ামজুমদার পৌছিলেন। এত কষ্ট করিয়া গিয়াও সেখানে চাকুরি মিলিল না। সেখানে দু-একমাস থাকিয়া পূজার সময় গগন বাবুর সঙ্গেই দেশের দিকে আসিয়া পরে ঢাকা জিলার রোজদী গেলেন। তারপর শ্যামগ্রাম হইয়া বাড়ী আসিলেন। নানাপ্রকারে বিফল মনোরথ হওয়ায় এবং নানাস্থানে ঘুরাফিরা করায় গ্রামের অনেকেই তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য এবং অনাদর দেখাইতে লাগিল।

কোথাও কিছু হইল না দেখিয়া মাতার উপদেশ মত আবার কুমিল্লা পড়িতে গেলেন, স্কুলেও ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু ব্যবসায় করিয়া অর্থাভাব

ঘুচাইবেন এই চিন্তায় তাঁহার পড়ায় মন বসিল না। কিছুদিন পর আবার স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। তখন তিনি কুমিল্লা বঙ্গবিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়াইবার জন্য শিক্ষকতা কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গবিদ্যালয়ে তখন ইংরেজী অবশ্য-পাঠ্য বিষয় ছিল না। যাহারা ইংরেজী পড়িত তাহারা ইংরেজী শিক্ষকদিগকে।০ চারি আনা অতিরিক্ত বেতন দিত। ইহাই ছিল মহেশচন্দ্রের প্রাপ্য। এইরূপে তিনি শিক্ষকতা দ্বারা মাসে ৩৲।৪৲ টাকা পাইতেন, সময় সময় কিছু বেশীও হইত। কয়েক মাস চাকুরি করার পর তাহার হাতে সামান্য টাকা জমিল। ইহা লইয়াই আবার কলিকাতা রওযানা হইলেন। ইহা তাঁহার তৃতীয়বার কলিকাতা যাত্রা।

এবার কলিকাতা আসিয়া কিছুদিন পরেই ১০২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ১২৮৯ সালে একটা মুদি দোকানের পত্তন করেন। কয়েকমাস দোকান করাব পর কর্ম্মচারীর চুরির দরুণ লোকসান হওয়ায় ঐ দোকান তুলিয়া দেন। তৎপর মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে রাধামোহন কুণ্ডের দোকানে ৫৲ বেতনে চাকুরি করেন। যাহার পরিবর্ত্তে তিনি কাজ করিতেছিলেন সে ফিরিয়া আসায় তাঁহার এই চাকুরিও গেল। তারপর তিনি ছোট একটা মনোহারী দোকান খোলেন। অনভিজ্ঞতার দরুণ তাহাও চলিল না। তিনি আরও দু-তিন জায়গায় চাকুরি করেন কিন্তু কোনটাতেই সুবিধা হইল না। চাকুরি করিবার ধাতও তাঁহার ছিল না। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার মনে ধিক্কার জন্মে এবং আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়। আত্মহত্যা করিলে মাতাঠাকুরাণীর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে ইহা ভাবিয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন না।

তারপর তিনি কুমিল্লার শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদয়াল সিংহ মহাশয়ের দোকানের জিনিষপত্র কলিকাতা হইতে কিনিয়া সরবরাহ করিবার

ভার লন। গুরুদয়াল বাবু তাঁহাকে মাসিক ৫৲ করিয়া দিতেন, তখন কলিকাতায় মেসের খোরাকিও পাচ টাকা লাগিত। এই কাজ হাতে লওয়ার পর খোরাকির চিন্তা কিছু দূর হইল। সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লার এবং আরও দু-এক জায়গার কয়েকজন দোকানদারের জিনিষপত্র পাঠাইবার কাজ পাইলেন। ইহাতে কিছু লাভ হইতে লাগিল। তারপর ৮২নং কলেজ ষ্ট্রীটে ষ্টেশনারী এবং বহির দোকান খুলিলেন। ষ্টেশনারী দোকানে লাভ না হওয়ায় তাহা কিছুদিন পর তুলিয়া দেন। তৎপর পুস্তক প্রকাশ ও কাগজের ব্যবসায় করেন। পুস্তক প্রকাশে কিছু কিছু লাভ হইল কিন্তু কাগজে সুবিধা হইল না। Order supply এর কাজ পূর্ব্বের মতই চলিতেছিল, দিন দিন কিছু সুবিধাই হইতেছিল। কুমিল্লায় গুরুদয়াল সিংহ এবং দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়গণ মহেশচন্দ্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ছিলেন ব্রাহ্ম। দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় কলিকাতা থাকাকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মপল্লীতে বাসা নিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র দ্বিজদাস বাবুর বাসায়ই অবস্থান করিতেন। এই সূত্রে তিনি আচার ব্যবহারে অনেকটা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখনও তাঁহাব বিবাহ হয় নাই। দেশে রটিয়াছিল মহেশবাবু পৈতা ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন। একে দোকানদারী করিয়া পতিত, তাহাতে আবার ব্রাহ্ম! তাঁহাকে কোন্ ব্রাহ্মণ মেয়ে দিতে রাজী হইবে? অবশেষে অনেক চেষ্টার পর তালসহর নিবাসী বিশিষ্ট তালুকদার ৺নন্দকুমার তলাপাত্র মহাশয়ের কন্যা হরসুন্দরী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর হইতেই মহেশচন্দ্রের ভাগ্যোদয় পরিলক্ষিত হয়, ব্যবসায়ের আয় বাড়িয়া যায় এবং দিন দিন উন্নতি হইতে থাকে। ইহা মহেশচন্দ্র নিজেও মনে করিতেন।

অনুমান ১২৯৬ সনে পুত্র ৺মন্মথের জন্ম হয়। কিছুকাল পর ৭৮নং কলেজ ষ্ট্রীটে ঘর ভাড়া করিয়া হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর খোলেন। দোকানের প্রাথমিক বিপদ ও ঝঞ্ঝাট কাটাইয়া উঠিলে দেখা গেল দোকান ভালই চলিয়াছে; কিন্তু ফার্ম্মাকোপিয়া ইত্যাদি পুস্তকগুলি সবই ইংরেজী ভাষায় লিখিত এবং মূল্যও অত্যধিক। সাধারণ লোকের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন এবং সংগ্রহ করিতে পারিলেও বুঝিতে কষ্ট হয়। অতএব তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সস্তা করিয়া ফার্ম্মোকোপিয়া ছাপান কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাঁহার বন্ধু ডাঃ উমাচরণ মিত্রের সাহায্যে ফার্ম্মোকোপিয়া প্রকাশ করেন। কিছুকাল পরে তিনি বিভিন্ন লোকের সহায়তা নিয়া "পারিবারিক চিকিৎসা" নামক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সমগ্র বাংলাদেশে (ভারতবর্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না) ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি বিস্তারে সাহায্য করিয়াছেন। এই সব পুস্তক প্রকাশ কার্য্যে শ্রদ্ধাস্পদ উমাচরণ বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে, শুধু দরিদ্র দেশে হোমিওপ্যাথি বিস্তারকল্পে যে স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া মহেশচন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠান বহু সংখ্যক হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থাদির অনুবাদ ও প্রকাশ দ্বারা সমাজের যে সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহার তুলনা হইতে পারে না। উমাচরণ মিত্র সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র তাঁহার আত্মকথায় লিখিয়া গিয়াছেন—"এমন নিরভিমান, এমন শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত, এমন সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, কর্ম্মক্ষেত্রে এমন নিষ্কাম পুরুষ আমি আর দেখি নাই। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার মূলে মিত্র মহাশয়ের প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।"

১২৯৯ সালে মহেশচন্দ্র ৮১নং কলেজ ষ্ট্রীটে এলোপ্যাথিক ষ্টোর খোলেন। ঐ এলোপ্যাথিক ষ্টোর এক বৎসর পর ২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাঘওয়ালা ডাক্তারখানা কিনিয়া তাহাতে স্থানান্তরিত করেন। প্রাচীন বাঘওয়ালা ডাক্তারখানার বাঘটী এখনও ২০৩নং এলোপ্যাথিক ষ্টোরে আছে; এবং এই বাঘের নামেই তাঁহার মাণিকতলা খালের ওপারে অবস্থিত ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা Tiger Chemical Works এর নাম হইয়াছে। ২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এলোপ্যাথিক ষ্টোর স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতেই দোকান বড হইতে থাকে। ১৩০২ সালে ১১নং বনফিল্ডস্ লেনে ক্ষুদ্র আকারে "ইকনমিক ফার্ম্মেসী" খুলিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মূল্য চারি আনা স্থলে পাঁচ পয়সা করেন। হোমিওপ্যাথিক ব্যবসায়ে ইহা এক যুগান্তর। বনফিল্ডস্ লেনের দোকানে প্রথম প্রথম বিক্রী খুবই কম হইয়াছিল এবং লোকসান হইতেছিল কিন্তু ইহাতে তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত দোকান চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে বিক্রয় বাড়িতে লাগিল এবং আয়ও কিছু হইতে লাগিল। এখন এই ইকনমিক ফার্ম্মেসী ভারতবর্ষের প্রধান হোমিওপ্যাথিক দোকান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধালয় করিয়া হাতে কিছু টাকা হইলে তিনি মাণিকতলা খালের পূর্ব্বধারে জমি বন্দোবস্ত নিয়া লোহার ঢালাইখানা ও কারখানা এবং করাত কল করেন। নানা কারণে কারখানা চলিল না। ইহাতে তাঁহার ১৮।২০ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছিল। ঔষধের দোকানগুলি উত্তরোত্তর ভালই চলিতেছিল; ইহাতেই তিনি লোহার কারখানার লোকসান কোন রকমে সামলাইয়া নিতে পারিয়াছিলেন। তারপর ঐ জমি ভাড়া

দিয়া ঐ লোকসানের পরিমাণ টাকা আদায় হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

ইহার পর ইকনমিক ফার্ম্মেসীর আলমারীর এক তাকে কিছু এলোপ্যাথিক পেটেণ্ট ঔষধ ও ফুড্ ইত্যাদি রাখিয়া বড়বাজার এলোপ্যাথিক ষ্টোরের পত্তন হয়। কিছুদিন পর নরসিং দত্তের বাড়ীতে বড় গুদাম নিয়া এলোপ্যাথিক ষ্টোর স্থানান্তরিত করা হইল। ইহার কিছুকাল পরেই ঢাকার দোকান খোলা হয়। কিছুদিন পর নরসিং দত্তের গুদামে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১০নং বনফিল্ডস্ লেনের বড বাড়ীতে এলোপ্যাথিক দোকান স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে আরও বড় বাড়ী ৮০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এলোপ্যাথিক ষ্টোর এবং ৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট বড় বাড়ীতে ইকনমিক ফার্ম্মেসী চলিতেছে। কলিকাতা শহরের নানাস্থানে, কুমিল্লায় এবং কাশী ও ঢাকায় তাঁহার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান রহিয়াছে।

মধ্য সময়ে একবার কুমিল্লা গেলে (১৯০০ইং সনে) কতিপয় আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে মহেশচন্দ্র কুমিল্লায় একটি কাপড়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। মহেশচন্দ্রের বন্ধু বরদাসুন্দর পাল মহাশয় এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী। ইহা M. Bhattacharyya & Co. (Comilla) Limited, Comilla নামে কয়েকজন আত্মায়ের টাকা লইয়া এবং নিজেও কিছু টাকা দিয়া তাহাদেরই অনুরোধে একটি প্রধান কাপড়ের দোকান রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাতে মহেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। এই দোকান প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুমিল্লার কাপড় ব্যবসায়ের কতগুলি দুর্নীতি দূর করিয়া একদর প্রবর্ত্তন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই দিক হইতে এই দোকান প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ সার্থক

হইয়াছে। বর্ত্তমানে নানা কারণে মাল জোগান ও সরবরাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে বহুবিধ অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নিবন্ধন, মহেশচন্দ্রের পুত্র শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) দোকান গুটাইয়া ফেলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতার ব্যবসায় খুবই চমৎকার চলিতেছিল, দানও যথেষ্ট, যশঃখ্যাতি অনেক, এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। পুত্র মন্মথ মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে (অনুমান ১৩১৬ সালে) কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সংসার অন্ধকার হইল। কুমিল্লার বাড়ী নূতন হইয়াছে তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কুমিল্লার বাড়ীতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিল। মন্মথের মৃত্যুর তের দিনের দিন মহেশচন্দ্র সস্ত্রীক ৺বৈদ্যনাথ চলিয়া গেলেন। বাড়ী ঘর, দোকান পাট, আশা ভরসা সব পড়িয়া রহিল! তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীরা দোকান পাট আগুলিয়া রহিল।

প্রায় দুই বৎসরকাল তিনি বৈদ্যনাথ ছিলেন। তখন মৃত্যুকামনা ও পুত্র কামনাই ছিল তাঁহার কামনার বিষয়। বৈদ্যনাথে Dr. Miss Longdon পরিচালিত American Mission এর একটা Orphanage ছিল। মাঝে মাঝে তিনি উহা দেখিতে যাইতেন। উক্ত Orphanage দেখিয়া তাঁহার মনে একটা Orphanage করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। তাহার পর তিনি কাশী যাইয়া দুই বৎসর থাকেন। কালধর্ম্মে শোকাবেগ কিছু প্রশমিত হইলে, তাঁহার দেশে আসিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কলিকাতা না গিয়া বেলুড় মঠের দক্ষিণদিকে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাল থাকেন। ঐ সময় মঠের সন্ন্যাসী মহারাজদের অনেকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সন্ন্যাসীদের চরিত্র এবং কাজ

কর্ম্ম ও সেবা ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাদের কর্ম্মে সহযোগিতা করিতে থাকেন। তদবধি মহেশচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের মারফৎ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি দৈব-দুর্ব্বিপাক দ্বারা ক্লিষ্ট জনগণের সেবার নিমিত্ত বহু অর্থ দান করেন। পরবর্ত্তীকালে অভয় আশ্রম, ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ, হিন্দুমিশন, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াও অনেক জনহিতকর কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল এইরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া বৈদ্যনাথ, কাশী এবং বেলুড় ইত্যাদি স্থানে কাটাইয়া তিনি কুমিল্লায় আসিয়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন।

মহেশচন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার দোকানগুলি বেশ বড় হয়। তখন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফকির দাস সরকার ইকনমিকের এবং কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য এলোপ্যাথিক ষ্টোরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বস্ততা, যত্ন এবং মমত্ব বোধেই এই দোকানগুলি রক্ষা পাইয়াছিল।

মহেশচন্দ্র ছিলেন কর্ম্মবীর। ক্রমে শোকাবেগ কিছুটা শান্ত হইলে তাঁহার প্রাণ কাজের জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। দৈনিক ও মাসিক রিপোর্ট এবং চিঠিপত্র মারফৎ কিছু কিছু দোকানের কাজ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল কুমিল্লার অসম্পূর্ণ বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ করা এবং দানের ক্ষেত্র বাড়াইয়া দানের কাজ সুসম্পন্ন করা। তিনি কুমিল্লায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে মূল বাড়ী সম্পূর্ণ করিবার কাজে হাত দেন। তারপর ক্রমে টোল, মাইনর স্কুল, হাইস্কুল (ঈশ্বর পাঠশালা), রামমালা ছাত্রাবাস, নিবেদিতা স্কুল, ছাত্রীনিবাস, বোর্ডিং বাড়ী ইত্যাদি গঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার কাজ এবং দানের বিস্তৃত বিবরণ এবং পরিমাণসহ জীবনেতিহাস লিখা আমার অসাধ্য—স্থানও ইহা

নহে। দানে গোপনীয়তা এবং কার্য্যে মন্ত্রগুপ্তি তাঁহার এত বেশী ছিল যে তাঁহার দানের কথা আমাদের মত নিকটতমেরাও সামান্যই জানিত এবং কাজও কখন কি ভাবে কেন হইতেছে তাহা সকলে বুঝিত না।

এই সময়েই তিনি নিজের জন্মভূমি বিটঘর গ্রামের উন্নতির জন্য নানাবিধ কার্য্য এবং বহু অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। বিটঘর গ্রামের রাস্তাঘাট, খাল ইত্যাদি সংস্কার ও খনন, হাইস্কুল, বাজার প্রভৃতির উন্নতি; প্রাচীন দীঘি ও পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, শিক্ষা বিস্তার কল্পে বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব এবং কতিপয় মাইনর স্কুল স্থাপন—এবম্বিধ নানাপ্রকার কার্য্যে অর্থ ও মন ঢালিয়া দিয়া কতদিকে কত কাজ যে করিয়াছেন তাহা গণনাতীত।

শেষ বয়সে তিনি আবার ৺কাশীবাসী হন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পর্য্যায়ক্রমে বিন্ধ্যাচল ও কাশী এই দুই জায়গায় থাকিতেন। ঐসব স্থানেও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং মন্দির মেরামত, রাস্তা তৈয়ার ইত্যাদি বহু প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বিন্ধ্যাচল বা কাশীতে থাকার সময়ও দেশকে তিনি ভুলেন নাই। গ্রামে সড়ক নির্ম্মাণ, নানাস্থানে লৌহসেতু নির্ম্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি কার্য্য নিয়মিতভাবে হইতেছিল। তিনি সর্ব্বদা পত্র দ্বারা খোঁজ খবর নিতেন এবং পুত্র শ্রীমান্ হেরম্বচন্দ্রকে তথায় পাঠাইয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করাইতেন।

১৩৫০ বাংলা সনের ২৭শে মাঘ, মাঘী-কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে ৮৬ বৎসর বয়সে এই বিচিত্র-চরিত্র মহাপুরুষ ৺কাশীধামে ৺শিবত্ব প্রাপ্ত হন।

গুণমুগ্ধ সেবক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা।